Moner Moto Mon by Somoresh Majumdar

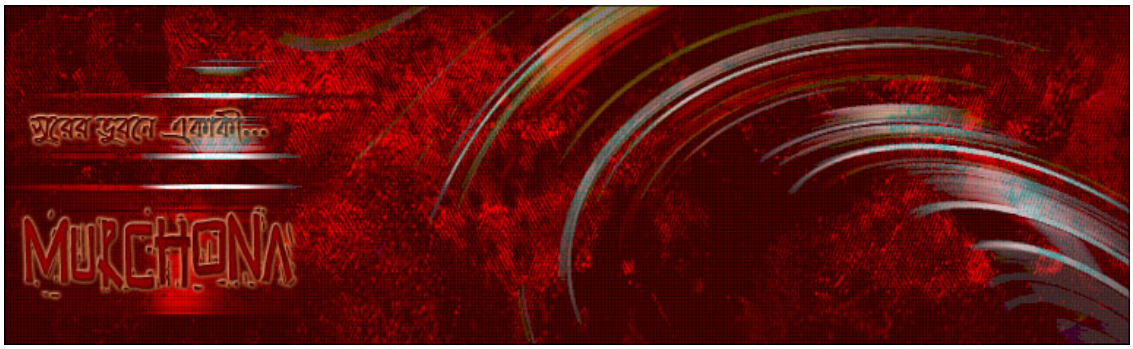

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

মনের মতো মন

সমরেশ মজুমদার

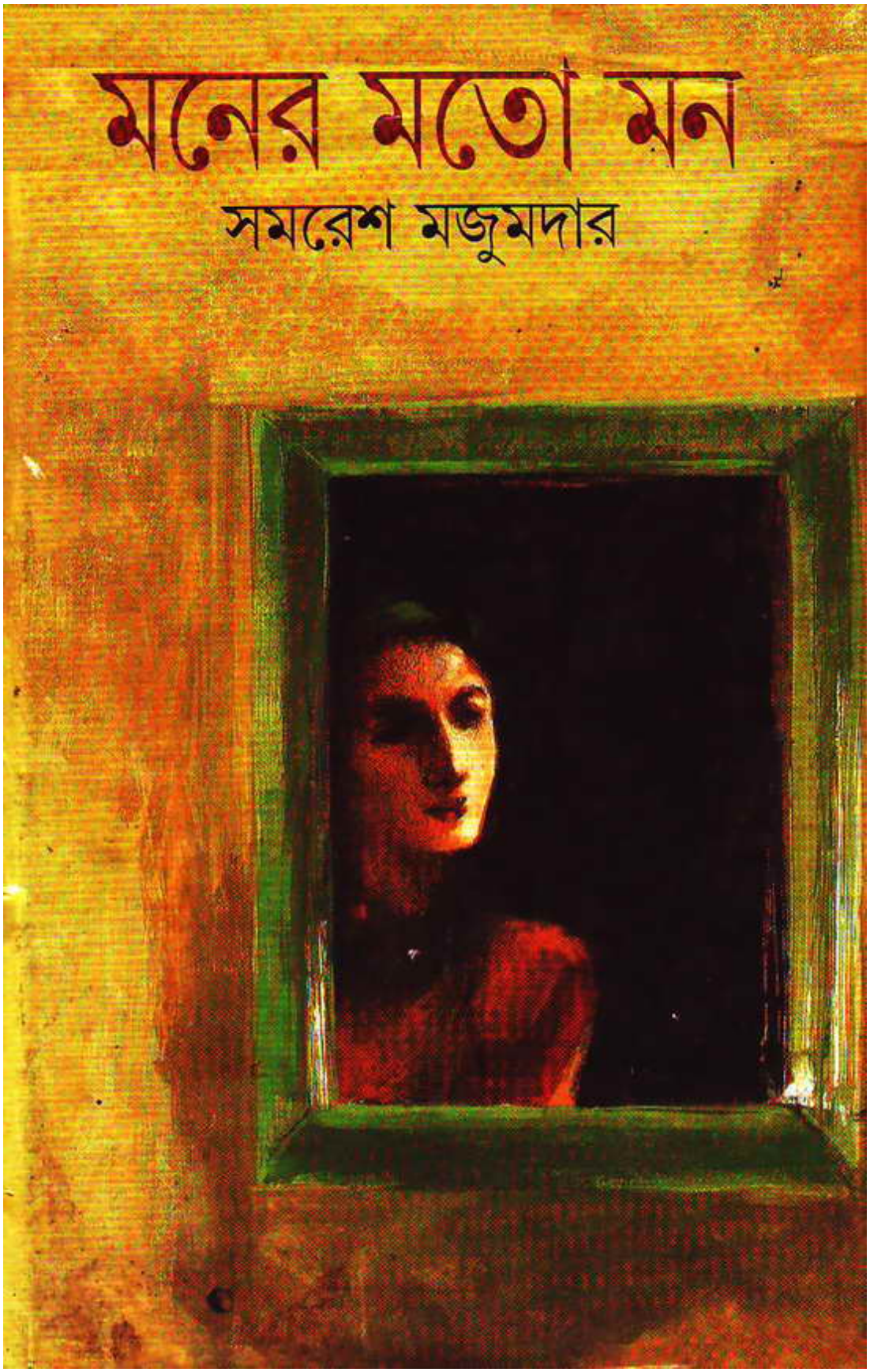

তখনও কলকাতার নব্বুই ভাগ মানুষ বিছানায়, ঘন ছায়া নেতিয়ে রয়েছে উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়ির শরীরে, গলিতে। স্বপ্নাশিষ আলতো দৌড়ের ভঙ্গিতে দেশবন্ধু পার্কের দিকে যেতে যেতে বুঝতে পারল তার কেড্‌সের আয়ু বেশিদিন নেই। আজকেই যদি আবার সেলাই ছিঁড়ে যায় তা হলে বেকায়দায় পড়তে হবে। পকেটে মাত্র দশটা টাকা পড়ে আছে, মাস শেষ হতে আট দিন বাকি।

দৌড় বন্ধ করে সাবধানে হাঁটতে লাগল সে। পিতৃদেব হুকুম জারি করেছেন, আঠারো বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর হাতখরচ বাবদ মাসে ষাট টাকা দেবেন তিনি। এ ছাড়া কলেজের মাইনে, চারবেলা খাবার আর বছরে দুটো শার্ট আর প্যান্ট। স্বপ্নাশিষের দাদা দেবাশিষ খুব নরম প্রকৃতির, এবার এম বি দিচ্ছে, নিরীহ গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিন্তু আন্ডার গার্মেন্টস্ ছাড়া বাইরে বের হওয়া যাবে না যে!'

পিতৃদেব তাঁর প্রথম সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। দেবাশিষ স্কুলে বরাবর প্রথম হত, জয়েন্টে ভাল নম্বর পেয়ে মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছিল। মায়ের ইচ্ছে ছিল তাঁর একছেলে ডাক্তার হবে। সেই ইচ্ছে পূর্ণ হতে চলেছে দেবাশিষকে ঘিরে। তাই পিতৃদেব কোনও কথায় আপত্তি থাকলেও বাধ্য হয়ে মেনে নেন। সেটা বোঝা যায় তাঁর পা নাচানোর ভঙ্গিতে। স্বপ্নাশিষ বললে হুঙ্কার দিতেন, 'কেন? তোমাকে কড়কড়ে ষাট টাকা দেওয়া হচ্ছে না?' কিন্তু বড় ছেলে বলে কথা। অবশ্য দেবাশিষ এমন নরম গলায় কথা বলে যে চমৎকার সারল্য ফুটে ওঠে।

দেশবন্ধু পার্কে ঢুকে স্বপ্নাশিষ চারপাশে তাকাল। এরমধ্যে দলে দলে লোক মাঠের চারপাশে চক্কর মারছে। বেশির ভাগ হয় রোগা নয় বেশ মোটা। আর চল্লিশ পার হওয়াদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মেয়েদের একটা দল হাঁটছে যাদের সম্পর্কে সুব্রত বলেছিল একেবারে কালনাগিনী। কাছাকাছি কাউকে ওদের দিকে তাকাতে দেখলেই বলে, 'চোখ গেলে দেব।'

www.murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

স্বপ্নাশিষের বাড়িতে মহিলা বলতে কেলোর মা। জ্ঞান হবার পর থেকে সে ওকে একই চেহারায় দেখে আসছে। ভোরবেলায় হুটহাট শব্দ করতে করতে বাড়িতে ঢোকে চ্যালাকাঠের মতো শরীর নিয়ে, সকাল দশটার মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে যায়। আবার বিকেলে আসে ঘণ্টা তিনেকের জন্যে। শীতবর্ষায় কামাই করতে দেখেনি কোনওদিন। একটু রেগে গেলেই চিৎকার শুরু করে এই বলে, 'তোদের জন্মাতে দেখলাম—।'

অতএব মহিলারা কেন চোখ গেলে দেবার ভয় দেখান তা স্বপ্নাশিষের জানা নেই। তবে মাঝে মাঝে জানতে খুব ইচ্ছে হয়। আচ্ছা, খুব বিনীত ভঙ্গিতে সামনে গিয়ে ওদের নমস্কার করে যদি কারণটা জিজ্ঞাসা করে তা হলে কী খুব খারাপ ঘটনা ঘটবে ?

স্বপ্নাশিষের যেহেতু সাহস কম তাই সে চুপচাপ মাঠে নেমে পড়ল। দেশবন্ধু পার্কের ভেতরে তখন বেশ কয়েকটা দল অনুশীলন শুরু করেছে। দৌড় থেকে শুরু করে ক্রিকেট, কি নেই। দূর থেকেই দেখতে পেল হরিমাধবদা ব্যাট করছে। চারজন বোলারের মধ্যে সুব্রতও আছে। তাকে দেখতে পেয়ে হরিমাধবদা খিঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে নবাবপুত্তুর, এতক্ষণে আসার সময় হল ? জীবনে বড় ক্রিকেটার হতে পারবি না।'

স্বপ্নাশিষ জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করল। হরিমাধব আবার চিৎকার করলেন, 'কৈফিয়ত না দিলে আজ তোকে আমি ব্যাট ধরতে দেব না। তোদের জন্যে আমি এখানে পাঁচটা থেকে অপেক্ষা করছি আর তোরা বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছিস। এইজন্যে বাঙালি কখনও শচীন হতে পারবে না, বড়জোর সৌরভ হয়েই ফুটে যাবে।'

হরিমাধব যে কথাগুলো বলছিলেন তা মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রাতঃভ্রমণকারীদের কানে যাচ্ছিল। সকৌতুকে স্বপ্নাশিষকে দেখছিল তারা। স্বপ্নাশিষ কোনওমতে বলতে পারল, 'আর কখনও দেরি হবে না। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আসব।'

হরিমাধব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কটা বাজে ?'

স্বপ্নাশিষের হাতে ঘড়ি নেই, সুব্রত ঘড়ি দেখে বলল, 'পাঁচটা একত্রিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। তুই একটা ইডিয়ট স্বপ্ন।'

'ইয়েস। তুমি একটি গর্দভ। তোমার অপনেন্ট তোমাকে ব্লাফ দেবে আর তুমি বোকা হয়ে সেটা গিলবে। কেন আমার মুখের ওপর বলতে পারলি না আপনি ভুল করছেন আমি ঠিক সময়ে এসেছি। প্রটেস্ট করতে শিখবি কবে ?'

স্বপ্নাশিষের আফসোস হচ্ছিল। হরিমাধবদা তাকে এমন বোকা বানাবেন আগে তা সে ভাবতে পারেনি। বাড়ি থেকে বের হবার সময় সে ঘড়ি দেখেনি। ধমক শুনে সে বিশ্বাস করেছিল সত্যি সত্যি তার দেরি হয়ে গেছে। কী কাণ্ড!

হরিমাধবদা ডাকলেন, 'ধর। সুব্রত আজ মাপা লেংথে বল ফেলছে। কিন্তু ওই বল থেকে তোকে রান তুলতে হবে। ধর বারো বলে কুড়ি রান। ফেস্ কর।'

স্বপ্নাশিষ ভাবল প্যাড পরার অনুমতি নেবে কি না। নেটে প্যাড পরতে বলেন হরিমাধবদা কিন্তু ভোরবেলার এই প্র্যাকটিসে সেটা পছন্দ করেন না। বলেন, 'বলটা ব্যাট দিয়ে মারার জন্যে। যদি তোর পায়ে বোলার বল ঠোকে তা হলে এল বি ডব্লু হয়ে যাচ্ছিস তুই। না না, ফ্রন্ট ফুট থিওরি আমি ভোরবেলায় মানব না। পা দিয়ে লোকে ফুটবল খেলে ক্রিকেট নয়। প্যাড না পরার জন্যে যদি উন্ডেড্ হও সেটাই তোমার পাওনা।' অতএব স্বপ্নাশিষ ব্যাট হাতে তৈরি হল।

হরিমাধবদা চলে গেছেন বোলার এন্ডে। চারজন বোলার আর একজন উইকেট কিপার ছাড়া এই সময় কোনও ফিল্ডার নেই। বাঁ দিকের পাঁচিলটায় বল লাগানো চার, ওটা ডিঙোলে ছয়। ডানদিকের গাছটা বাউন্ডারি। এসব মুখস্থ। প্রথম বলটা করল সুব্রত। গুড লেংথ বল। মাটিতে পড়ে নিচু হয়ে অফ স্ট্যাম্পের দিকে যাচ্ছিল। মারতে গিয়ে সামনে নিয়ে ডিফেন্স করল স্বপ্নাশিষ। হরিমাধবদা চিৎকার করলেন এগারো বল, কুড়ি রান। ইডিয়ট, তুই পাঁচদিনের টেস্ট ওপেন করতে আসিসনি!'

স্বপ্নাশিষ বলল, 'এই বল মারব কী করে?'

'গুডলেংথটাকে ওভারপিচ বানিয়ে নে। থ্রো দেখে পায়ের কাজ করতে পারছিস্ না?'

'মিস করলে বোল্ড বা স্ট্যাম্পড হয়ে যেতে পারি।'

'হলে হবি। আমি তো তোকে বলিনি আউট হলে বারো বল পাবি না।'

স্বপ্নাশিষ আবার বোকা বনল। হরিমাধবদার স্বভাব হল কথার প্যাঁচে ফেলে জব্দ করা। সুব্রত দ্বিতীয় বলটি ডেলিভারি দেবার মুহূর্তে সে দুপা এগিয়ে গেল। এবার বলটা গুডলেংথে স্পটে না পড়ে ফুলটস হয়ে গেল। স্বপ্নাশিষ এগিয়ে যাওয়ায় বল মারার পজিশনে পেল না। কোনমতে বুকের কাছে ব্যাট তুলে শেষ মুহূর্তে সে বলে ছোঁয়াতে পারল। কিন্তু ততক্ষণে বল উঠে গেছে ওপরে। সুব্রত দৌড়ে এসে

ক্যাচ লুফে নিয়ে চিৎকার করল, 'আউট।'

সাড়ে সাতটায় হরিমাধবদা তাদের ছাড়লেন। এখান থেকে সোজা শ্যামবাজারে গিয়ে বাজার করে বাড়ি ফিরবেন তিনি। ভদ্রলোক বিয়ে করেননি। ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন। ক্রিকেটই তাঁর ধ্যানজ্ঞান, জীবন। বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলেছেন দু বছর। সেইসময় ক্লিকে পড়ে বাদ যান দল থেকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অন্তত বাইশজন রঞ্জি প্লেয়ার তৈরি করেছেন এই মাঠ থেকে। প্রায়ই বলেন, 'পরিশ্রম কররে। পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। যারা ইন্ডিয়া খেলে তাদের যে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা ভেবে দেখ। পড়াশুনা, খাওয়াদাওয়ার সময় ছাড়া যখন বাড়িতে থাকবি তখনই ক্রিকেটের কথা ভাববি। একজন বোলার তোকে ফাঁসাতে চাইছে কিন্তু তুই কখনই তার ফাঁদে পা দিবি না। অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল মুখ কুটকুট করা কচু তোর কাছে এক জিনিস বলে মনে করবি। এমনিতে তোরা বেশি বয়সে শুরু করেছিস। এবার যদি বেঙ্গলে ডাক পাস তা হলে পারফরমেন্স দেখাতে হবে।'

হরিমাধবদা যে টিমকে কোচ করেন সেই টিমেই ওরা খেলে। গতবছর প্রথম সুযোগ পেয়েছিল সে। মোট চারটে ম্যাচ খেলে অ্যাভারেজ তিরিশ। এবার প্রতিটি ম্যাচে খেলাচ্ছেন হরিমাধবদা। টিম এবার লিগে তিন নম্বরে। চারটে সেঞ্চুরি হয়ে গেছে এর মধ্যে। খবরের কাগজে ছবি বেরিয়েছিল চারবার।

পিতৃদেব সেই ছবি দেখতে পেয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, 'তোমার নাম লিখেছে, একই নামের হাজার লোক থাকতে পারে, ছবিটা তোমার কিনা দেখো।'

মাথা নিচু করেছিল স্বপ্নাশিষ, 'হ্যাঁ।'

'ছেলের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হলে বাবা খুশি হয় কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমার কী করা উচিত। কলেজের পর ক্রিকেট খেলো বলে তোমার দাদা আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু এ তো পেশাদার খেলা, সারাদিন পড়াশুনা জলাঞ্জলি দিয়ে মাঠে পড়ে থাকতে হয়। এ সব যদি কর তা হলে ধরে নেব ভাল পয়সা পাচ্ছ, সামনের মাস থেকে হাতখরচা দেবার দরকার নেই।'

আশঙ্কিত স্বপ্নাশিষ বলে উঠেছিল, 'আমি কোনও টাকা পাই না।'

'তা হলে সময় নষ্ট করছ কেন ? তোমার খবর খবরের কাগজ যখন ছেপেছে তখন বুঝতে হবে পেছনে মোটা টাকার লেনদেন আছে। সারাদিন ধরে তোমাদের ওরা খাটিয়ে পয়সা দেবে না এটা অন্যায়। কাল থেকে আর মাঠে যাওয়ার দরকার নেই। মন দিয়ে পড়াশুনা করো যাতে

কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা কাজকর্ম জোটাতে পারো।' পিতৃদেবের এই নির্দেশের ওপর কথা বলার সাহস স্বপ্নাশিষের ছিল না। তার ক্রিকেট জীবন ওখানেই শেষ হয়ে যেত যদি দাদা দেবাশিষ এগিয়ে না আসত। বড় ছেলের কথা পিতৃদেব সাধারণত অর্ধেক মেনে নেন, এবারও তাই হল। ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে খেলা চলবে না। রেজাল্ট খারাপ হলে খেলা বন্ধ করতে হবে। শেষমেষ তাঁর বক্তব্য, 'হতচ্ছাড়া ব্যাপার। একটা লোক দৌড়ে এসে বল ছুড়ছেন আর একজন ব্যাট হাতে সেটা হাঁকড়াচ্ছেন। কী বাহাদুরি। শরীরের কোনও কসরত নেই, শক্তি দেখাবার সুযোগ নেই, শুধু কয়েক গজের মধ্যে ছোটাছুটি করা। এই জন্যেই আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, জাপানিরা, পৃথিবীতে যারা সভ্য বলে স্বীকৃত তারা ক্রিকেট খেলে না।'

কথাটা মনে ঢুকেছিল স্বপ্নাশিষের। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিল। ক্রিকেট খেলে ইংলন্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্ট্রেলিয়া ভারত পাকিস্তান শ্রীলংকা। কিছু কিছু দেশ এখন আসছে খেলতে। সাউথ আফ্রিকা একসময় খেলত, মাঝখানে অচ্ছ্যুৎ ছিল, আবার খেলছে বাকি পৃথিবীতে কেউ গাওস্করের নাম দূরের কথা ডন ব্র্যাডম্যানের নাম জানে না।

সুব্রত একদিন কথাচ্ছলে হরিমাধবদার কাছে প্রসঙ্গটা তুলেছিল। হরিমাধবদাকে এক মুহূর্তের জন্যে উদাস দেখাল। তারপর মাথা নাড়লেন তিনি, 'এই যে দেশগুলোর নাম বললে তাদের সবার ক্ষেত্রে একটা মিল আছে, কী বল তো?'

স্বপ্নাশিষ শুনেছিল ফরাসিরা ইংরেজি বলে না। জার্মানরাও প্রায় তাই। কিন্তু এই দেশগুলোতেও ইংরেজির চল আছে। আর ক্রিকেটের ভাষা ইংরেজি। সে এই উত্তর দিল।

হরিমাধবদা বললেন, 'কিছুটা হল। আসলে এইসব দেশই একসময় ইংরেজদের অধীনে ছিল। কলোনি বলতে পারো। ব্রিটিশরা ক্রিকেট খেলত, তারা তাদের কলোনির মানুষদের খেলাটা শিখিয়েছে বলে সেখানে ক্রিকেটের চল হয়েছে।'

সুব্রত বলল, 'সেই ইংল্যান্ডকেই তো অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া হরদম হারাচ্ছে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

স্বপ্নাশিষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমেরিকানরাও তো ইংরেজি বলে, সেখানেও ইংরেজরা গিয়েছিল তিনশো বছর আগে, তা হলে আমেরিকায় ক্রিকেট জনপ্রিয় নয় কেন?'

'আমেরিকায় ইংরেজরা গিয়েছিল সোনার লোভে। গিয়ে থেকে গিয়েছিল। তেমনি স্পেনিশ, ডাচরাও ও দেশে যায় আগুপিছু। আমেরিকা কখনই ব্রিটিশদের কলোনি ছিল না যে তাদের ইচ্ছেমত সবকিছু ওদেশে হবে। এখন তো শুনেছি ব্রিটিশরা যা করে ঠিক তার উল্টো আমেরিকানরা করে। এমন কি ইংরেজিটাকেও নিজেদের মত করে নিয়েছে। যাক, হঠাৎ এ-সব প্রশ্ন কেন ? ভাল জিনিস সবসময় গ্রহণ করব আমরা। ব্রিটিশরা শিখিয়েছিল বলে যখন টেবিল চেয়ার কাপ প্লেট ফেলে দিচ্ছি না তখন ক্রিকেট আমাদের জীবন থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে না।'

সাড়ে সাতটা বাজা মাত্র হরিমাধবদা উইকেট তুলে নিলেন, 'কাল এরিয়ানের সঙ্গে খেলা। বিকেলে সবাই এসো। কিছু কথা বলব।'

সুব্রত বলল, 'এখনই বলুন না। বিকেলে একটা ঝামেলা আছে।'

'আমি তোমাদের বলিনি ম্যাচের আগের দিন নিজেকে ফ্রি রাখতে ?'

'কী করব বলুন ! আমার মাসিমা খুব অসুস্থ। স্বপ্নাশিষের একজন পরিচিত ডাক্তারকে নিয়ে যাওয়ার কথা ওঁর বাড়িতে। সিরিয়াস কেস।'

হরিমাধবদার গলার স্বর নরম হল, 'কী হয়েছে তাঁর ?'

'নার্ভের ব্যাপার।'

'ও। স্বপ্ন, তুই কাল ওপেন করবি।'

'আমি ? কেন ?'

'যা বলছি শোন। বেঙ্গল টিমে কোনও ভাল ওপেনার নেই। দুতিনটে ম্যাচে যদি ক্লিক করে যাস তা হলে কপাল খুলে যেতে পারে।'

'কিন্তু আমি যে অত ডিফেনসিভ খেলতে পারি না।'

'তোকে কে বলেছে ওপেনারদের ডিফেনসিভ খেলতে হবে ? ননসেন্স। অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছেড়ে দিবি, মারার বল যেমন মারিস তেমনি মারবি। প্রথম চারটে ওভার রিস্কি শট নিবি না। ব্যাস। বিকেলে এলে তোকে নিয়ে কিছুক্ষণ—। যাক গে, ওর মাসিমা যখন অসুস্থ তখন—। আর হ্যাঁ, সুব্রত, তুই শুধু মনে রাখবি তোকে অফ স্ট্যাম্পের ওপর বল রাখতে হবে। তিনকাঠির ওই একটি ছাড়া আর কিছু তুই চিনবি না। আজ যেমন গুড লেংথে বল ফেলছিলি ঠিক তাই চাই। আচ্ছা, গুড লেংথে বল ফেলছিস দেখে স্বপ্ন যখন এগিয়ে গেল তখন হঠাৎ ফুলটস করে দিলি কেন ? ওকে বোকা বানাতে ?'

সুব্রত হেসে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'ইডিয়ট ! ওটা না করে বলটা আর একটু স্লো ছাড়বি। ব্যাটসম্যান স্পেস বুঝতে না পেরে ফসকাবে আর অবধারিত স্ট্যাম্পড হবে।'

হরিমাধবদা চলে গেলেন। সুব্রত বাকিদের কাছ থেকে স্বপ্নাশিষকে কিছুটা দূরে সরিয়ে আনতেই স্বপ্নাশিষ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ওরকম গুল মারলি কেন ?'

'কারণ আজ বিকেলে আমরা আসতে পারব না, তাই।'

'আমরা আসতে পারব না কেন ? তোর কোন মাসি— !'

'আমার কোনও মাসি নেই। শ্যামনগরে যেতে হবে। তিরিশ ওভারের খেলা। দুজনের জন্যে পাঁচশো চেয়েছি। আজ কোয়ার্টার ফাইন্যাল। চটপট বাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে উল্টোডাঙা স্টেশনে চলে আয় সাড়ে নটার মধ্যে।'

'তুই খেপ খেলতে যাচ্ছিস।'

'আমি একা নই, তুইও যাচ্ছিস। যাঃ, আর দেরি করিস না।' সুব্রত উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। স্বপ্নাশিষ হতভম্ব। সুব্রত প্রায়ই কলকাতার আশেপাশে খেপ খেলে বেড়ায় কিন্তু এখন পর্যন্ত স্বপ্নাশিষ ও পথে যায়নি। হরিমাধবদার কড়া নির্দেশ আছে খেপ না খেলার। শ্যামনগরটা কোথায় চট করে মাথায় এল না। সেখানকার কোন টিমে তাদের খেলতে হবে তাও বলল না সুব্রত। ক্রিকেট এমন খেলা কোথাও কেউ একটু ভাল খেললেই খবর ছড়িয়ে যায়। বিপক্ষ দলেও পরিচিত খেলোয়াড় থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে হরিমাধবদার কানে খবর পৌঁছতে দু-একদিন লাগবে মাত্র। আর তা হলে একদম ছিঁড়ে খাবেন উনি। বেঙ্গল খেলার কোনও চান্স থাকবে না। স্বপ্নাশিষ দোটানায় পড়ল। তা ছাড়া আজ কলেজ আছে। এমনিতেই লিগ খেলার জন্যে ভাল কামাই হবে। কী করবে ভাবতে ভাবতে সে বাড়িতে ফিরে এসে শুনল পিতৃদেব তারস্বরে চিৎকার করছেন। এ বাড়িতে ঢোকার দুটো পথ আছে। জমাদার যে পথে ঢোকে সেই পথে ঢুকবে বলে স্বপ্নাশিষ মৃদু শব্দ করতে লাগল। এর পরিণতি হল উল্টো। কেলোর মায়ের গলা পাওয়া গেল ভেতর থেকে, 'সময় অসময় নেই হুট করে এলেই হল মুখপোড়া। এখন আমার নিশ্বাস ফেলার সময় নেই যে তোকে জল দিতে যাব। একঘণ্টা বাদে ঘুরে এসো।'

কেলোর মায়ের গলা কানে যাওয়ামাত্র পিতৃদেব আচমকা চুপ করে গিয়েছিলেন। এবার তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'আশ্চর্য ! একটু আস্তে কথা বলতে পারো না !'

'বলে কী হবে ? শুনতে পাবে না তো। আপনি এত জোরে জোরে কথা কইছেন—।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। সাত সকালে লোক এসেছে বাবুর খোঁজে

আর তিনি মর্নিং ওয়াকে গিয়ে এখনও ফেরেননি। আমাকে বলে কিনা যেমন করেই হোক ওকে আজ দুপুরে ক্লাবে পাঠিয়ে দেবেন। কেন? দুপুরে ক্লাবে গিয়ে আড্ডা মারবেন কলেজে ক্লাশ করার বদলে? আসুক ওর দাদা, হেস্তনেস্ত করব।

'মা মরা ছেলেটাকে বাবু বড্ড শাসন করেন!' কেলোর মায়ের গলা শোনা গেল।

'মা তো আমারও মরে গিয়েছে কবে, মা মরা মা মরা বলে আদিখ্যেতা করো না তো! এই করেই বাঙালির বারোটা বেজে গেল।'

এইভাবে চললে সাড়ে নটা এখানেই বেজে যাবে। স্বপ্নাশিষ ধীরে ধীরে সামনের দরজায় চলে এল। পিতৃদেব বসে আছেন বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারে। কেলোর মা অবশ্যই ভেতরের দাওয়ায়। দুজনের কথাবার্তা চলছে পরস্পরের মুখ না দেখে। এ সব এ বাড়িতেই সম্ভব। পিতৃদেব খুব শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'বসো।'

এই গলা অনেককাল শোনেনি স্বপ্নাশিষ, থতমত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে।'

'আমি তোমাকে বসতে বলেছি তবে ইচ্ছে করলে দাঁড়িয়েও থাকতে পারো। হ্যাঁ, শোনো তোমার সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের বলে দেবে বাড়িতে এসে আমাকে যেন হুকুম না করে। হুকুম সহ্য করতে পারি না বলে জীবনে চাকরি করিনি। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

স্বপ্নাশিষ কিছু না বুঝেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। কে তাকে কোথায় কোন ক্লাবে যেতে বলেছে সেই প্রশ্ন করার সাহস হল না। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এই বাড়ির ভেতরটা অদ্ভুত ধরনের। একটা ছোট্ট বাঁধানো উঠোন আছে। তার একপাশে রান্নার ঘর। বাথরুমটা উল্টোদিকে। ওপরে পিতৃদেবের শোওয়ার ঘর। পাশের ঘরটি তালা দেওয়া থাকে। ও ঘরে কোনও মূল্যবান জিনিষ আছে কিনা জানা নেই। জ্ঞান হবার পর থেকেই স্বপ্নাশিষ ওই তালা দেখে আসছে। নীচের পাশাপাশি দুটো ঘরে ওরা দুই ভাই থাকে। পিতৃদেবের ঘরের জানলা থেকে তাদের ঘরদুটোর দরজা দেখা যায়।

এ বাড়িতে রেডিও ছিল, এখন টিভি এসেছে। টিভি চলে যখন খবর হয়। কলকাতা দিল্লির খবরের পর চ্যানেল ঘুরিয়ে বি বি সি ধরা হয়। বি বি সি তো সারাক্ষণ পৃথিবীর খবর সাপ্লাই করছে। টিভির অপারেটার স্বয়ং পিতৃদেব। সিরিয়াল দূরের কথা কোনও ফিল্ম আজ অবধি ওই টিভিতে দেখার সুযোগ হয়নি। টিভিটা আছে বাইরের ঘরে। শুতে

যাওয়ার আগে পর্যন্ত পিতৃদেব ওখানে বসে থাকেন। ওয়ার্ল্ড কাপ বা ওই জাতীয় মধ্যরাতের খেলা স্বপ্নাশিষ ওই টিভিতে চুরি করে দেখেছে। শব্দ একেবারে বন্ধ করে খেলা দেখা যে কী বিরক্তিকর সেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে।

জুতো খুলে উল্টেপাল্টে দেখছিল সে। আজ সুব্রতর কথামত গেলে নিশ্চয়ই কিছু টাকা পাওয়া যাবে। সিজনে ওরা তো ভালই রোজগার করে। সেই টাকায় কি এক জোড়া কেডস হবে? হরিমাধবদা জানলে অবশ্য বারোটা বেজে যাবে। স্বপ্নাশিষ হঠাৎ দরজায় ছায়া দেখে চমকে তাকাল। কেলোর মা দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত মুখ করে।

'কী ব্যাপার?'

'তোমার সঙ্গে খুব দরকারি কথা আছে খোকা।' কেলোর মা ঘরে ঠুকে পড়ে বলল, 'কথাটা যেন কারও কানে না যায়।'

'কী কথা?'

'কেলোর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।'

'সে কী? কী ব্যাপার?'

'ওকে পেত্নীতে ধরেছে।'

'যাঃ। তোমাদের যত কুসংস্কার। বস্তির লোক বলেছে বুঝি?'

'অ্যাই দেখো, চিঠি। ওর প্যান্টের পকেটে পেয়েছি। আজ যখন ঘুমোচ্ছিল তখন বের করে নিয়ে এসেছি। পড়ে শোনাও তো কী মন্তর দিয়েছে।' কেলোর মা একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল। কাঁপা হাত থেকে সেটা নিয়ে খুলল স্বপ্নাশিষ। মাই ডারলিং। আই লাভ ইউ। তোকে ছাড়া আমার দিল দেয়ানা।

মনে মনে পড়ছিল স্বপ্নাশিষ, কেলোর মা ফিসফিস করে বলল, 'আঃ, আমি শুনব বললাম না, জোরে জোরে পড়ো।'

স্বপ্নাশিষ বলল, 'প্রচুর বানান ভুল।'

'ঠিকঠাক করে নাও না। লেখাপড়া শিখেছ কী করতে। মেয়েটা তো চার ক্লাশের ওপর পড়েনি যে ঠিকঠাক লিখবে। বিয়ে হয়েছিল যে গ্রামে সেখানে সিনেমা হল নেই বলে ছাড়ান করে দিয়ে ফিরে এসেছে। পড়ো।'

স্বপ্নাশিষ গড়গড় করে পড়তে লাগল, 'মাই ডার্লিং। আই লাভ ইউ। তোকে ছাড়া আমার দিল দেওয়ানা। গত শনিবার তুই আমাকে গ্রেসে সিনেমা দেখাবি। মনে হচ্ছিল আমি মাধুরী আর তুই অজয়। আ গলে লাগ্ যা। কিন্তু ডার্লিং, এভাবে কতদিন চলবে? মাইরি বলছি, মরে যাব। তোর মা—।' স্বপ্নাশিষ থেমে গেল। কেলোর মা সম্পর্কে খুব

খারাপ কথা লিখেছে। সে নীচে তাকাল, 'তুমারা মাধুরী।'

'কী হল ? থামলে কেন ?' কেলোর মা জানতে চাইল।

'ওই আর কী।'

'আমাকে গালি দিয়েছে ?'

'না না। লিখেছে, তোমার মাকে আমার খুব ভাল লাগে, খুব ভালমানুষ। আমার বাবা তোমার মায়ের প্রশংসা করত!' বানিয়ে বানিয়ে বলল স্বপ্নাশিষ।

'তা করবে না। যৌবনে আমার পেছনে ঘুরঘুর করত সে। ব্যাস ?'

'হ্যাঁ। এটুকুই।'

'কী করা যায় বলো তো খোকা।'

'কী আর করবে ?'

'কেলোর সপ্তাহে দুতিনদিন কাজ, নিজেরই চলে না। তা ছাড়া ওই পেত্নী ঘাড়ে চেপে সব শুষে নিচ্ছে। এবার ঘরে ঢুকলে আর দেখতে হবে না। এর আগে কত ছেলের ঘাড় মটকেছে তা কী বলব। আজই আমি কুরুক্ষেত্র করব।'

'খবরদার ওপথে যেও না। তা হলে কেলোও তোমার শত্রু হয়ে যাবে।'

'তাই বলে এ-সব আমি মেনে নেব ?'

'ছেলেকে বোঝাও না। আচ্ছা, মেয়েটা কেমন দেখতে ?'

'যৌবনে কুকুরীকে দেখতে ভাল লাগে। আমরণ, কার সঙ্গে এ-সব কথা বলছি। বাবু জানতে পারলে আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে। তা তুমি আমার ছেলের মতো। একটা পরামর্শ দাও। আমার বুকে আগুন জ্বলছে গো।' কাঁদো কাঁদো মুখে বলল কেলোর মা। স্বপ্নাশিষের খুব মায়া হল। সে বলল, 'আমাকে ক'দিন ভাবতে দাও। তদ্দিন চুপ করে থেকো। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। অনেকে শুনেছি বাধা পেলে আত্মহত্যা করে। কেলো ছাড়া তোমার তো কেউ নেই। আচ্ছা, ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। আর এখন যাও, চটপট ভাত দাও। চিঠিটা আমার কাছে থাকল।'

বাথরুমে ঢুকে গেল স্বপ্নাশিষ। কিন্তু তার মাথার ভেতর চিঠির লাইনগুলো প্রবলভাবে থেকে গেল। কেলো সম্ভবত তারই বয়সী। শৈশবে ওর মায়ের সঙ্গে এ বাড়িতে আসত। একটু আধটু খেলাধুলাও যে করেনি তা নয়। তারপর কেলোর মা ওকে কর্পোরেশনের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। সেসময় বইপত্তরের জন্যে আসত। কেলোর গায়ের রঙ কালো, স্বাস্থ্য ভাল, মাথায় মিঠুনের ছাঁট। একটু বড় হওয়া মাত্র এ

বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল কেলো। জিজ্ঞাসা করলে ওর মা বলত, 'দুঃখের কথা কী বলব খোকা, বলে যে বাড়িতে ঝিগিরি করো সে-বাড়িতে আমাকে যেতে বলবে না। পাড়ায় আমার প্রিস্টিজ আছে।'

কিন্তু স্বপ্নাশিষের সঙ্গে মাঝে-মাঝেই রাস্তাঘাটে দেখা হত। ছেলেবেলার তুই তোকারি তুমিতে উঠে গিয়েছে ততদিনে। একদিন দেশবন্ধু পার্কে সে ব্যাট করে ফিরছে, কেলো এসে বলল, 'তুমি মাইরি দারুণ খেলো তো!'

'তুই কী করছিস?'

'ড্রাইভিং শিখছি। ট্যাক্সি চালাব।'

'পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিস।'

'ধ্যুত। ওসব ভদ্রলোকের জন্যে। আমাকে এখন মালের ধান্দা দেখতে হবে।'

এর কিছুদিন বাদে কেলোকে পুলিশ ধরেছিল সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করার অপরাধে। কেলোর মায়ের তখন কী কান্না, 'আমার ছেলে এরকম করতেই পারে না। ওর বন্ধুরা টিকিট রাখতে দিয়েছিল বলে রেখেছিল।' পিতৃদেবের শরণাপন্ন হয়েছিল কেলোর মা। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, 'তোমার ছেলে বলে আমি কিছু বলছি না, আমার ছেলে এরকম করলে ত্যাজ্যপুত্র করতাম।'

সেই কেলো শেয়ারে ট্যাক্সি চালায়। রোজ গাড়ি পায় না বলে রোজগার কম। তবু তাতেই খুশি ছিল ওর মা। কিন্তু এই চিঠি বলছে কেলো প্রেম করছে। স্বপ্নাশিষের মজা লাগল। মেয়েটা যে ভাষায় লিখেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সিনেমার পোকা। কিন্তু চিঠি পড়লে গা কিরকম শিরশির করে। গায়ে জল ঢাললো সে। পরিচিত কোনও মেয়ের মুখ মনে করার চেষ্টা করল যে তাকে এই ভাষায় চিঠি লিখতে পারে। নাঃ কাউকে মনে পড়ল না। এ বাড়িতে কেলোর মা ছাড়া কোনও মহিলা নেই। মা মারা যাওয়ার পর পিতৃদেব আবার বিয়ে করতে পারতেন। তখন তো সে একেবারে শিশু। তিনি তা না করে বিবেকানন্দের বাণী মুখস্থ করেছেন। স্বপ্নাশিষ বিবেকানন্দের কোনও লেখা পড়েনি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় পিতৃদেব যা বলেন তার সবই বিবেকানন্দের লেখা কিনা! নারীবর্জিত জীবন যাপন করেছিলেন বলে এই সংসারে আর কোনও মহিলা আসেনি। স্বপ্নাশিষের মনে হচ্ছিল কেলো বেশ ভাগ্যবান।

খাওয়াদাওয়া সেরে খেলার পোশাক, জুতো ব্যাগে ভরে গম্ভীর মুখে সে পিতৃদেবের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি সম্ভবত চোখ তুলে

দেখেছিলেন নইলে স্বপ্নাশিষ তার পিঠে অস্বস্তি অনুভব করল কেন ? ওই সময় যদি তিনি ব্যাগ নিয়ে বের হবার কারণ জিজ্ঞাসা করতেন তা হলেই হয়ে গিয়েছিল।

উল্টোডাঙা স্টেশনের এনক্যুয়ারির সামনে সুব্রত দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে হেসে বলল, 'যাক, এসে গেছিস ! ওদের একজন বোলার আর ব্যাটসম্যান দরকার। তোকে তো বলেছি পাঁচ চেয়েছি, কত দেবে জানি না। যাই দিক ফিফটি ফিফটি।'

'কম দেয় নাকি ?'

'কম ? খেপ খেলতে গিয়ে আক্ষেপে পড়তে হয় অনেকসময়। পুরোটাই মেরে দেয়।'

'তা হলে যাচ্ছিস কেন ?'

'এখানে মারবে না। আমার মামাতো ভাই আছে ওই ক্লাবে। চল, টিকিট হয়ে গেছে।' ওভারব্রিজে উঠতে উঠতে সুব্রত বলল, 'হরিমাধবদাকে একদম বলবি না।'

'কিন্তু যদি জানতে পারে।'

'দূর। কোথায় শ্যামনগর আর কোথায় দেশবন্ধু পার্ক। তোর তো আজ হাতেখড়ি।'

'হ্যাঁ। ভয় লাগছে খুব।'

'শোন, মিনিমাম ফিফটি করতে হবে তোকে। তা হলেই আরও খেপ পাবি। আর বেঙ্গল খেলে ফেললে দেখবি দর উঠে গেছে হু হু করে।'

'আমার চাই না।'

'গাড়লের মত কথা বলিস না। সেদিন বলছিলি কেড্‌স কেনার টাকা নেই। আজই একটা হয়ে যাবে। তা হলে ? হরিমাধবদা যদ্দিন আছে তদ্দিন তুই ক্লাবের কাছে টাকা চাইতে পারবি না। অন্য ক্লাবে যাওয়াও সম্ভব নয়। বেঙ্গল খেলে মাল বানাবি কী করে ? বছরে এরকম কুড়িটা খেললে তবু ইজ্জত বাঁচবে।'

নৈহাটি লোকালে উঠে বসল ওরা। সকালের ট্রেন ভিড়ের উল্টো দিকে যাচ্ছে বলে কামরায় বেশি লোক নেই। বসামাত্র নজর গেল যার দিকে তার চোখে রোদচশমা, পরনে সালোয়ার কামিজ, হাতে মোটা বাঁধানো খাতা। উদাস ভঙ্গিতে জানলার ধারে বসে প্রকৃতি দেখছে চলন্ত ট্রেনে বসে। ওর চোখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু নাক, ঠোঁট, চিবুকের গড়ন জানিয়ে দিচ্ছে সৌন্দর্য কাকে বলে। গায়ের রঙে সকাল বেলার প্রথম রোদ মাখামাখি।

সুব্রত চাপা গলায় ডাকল, 'অ্যাই।'

সে মুখ ফেরাতে বলল, 'ওভাবে দেখতে নেই।'

'কী সুন্দর, না ?'

'বেল পাকলে কাকের কি ? আমরা কাক। বুঝলি। ওহো, তুই আজ ওপন করবি।'

সঙ্গে সঙ্গে চটকা কেটে গেল, 'মাথা খারাপ।'

'তোকে হরিমাধবদা তো তাই বলেছে। ওরা ওপেনার চাইছিল। এমনি টাকা দিচ্ছে নাকি ? অফের বল ছেড়ে দিবি, ব্যাস।'

'বেশি জ্ঞান দিস না। কী টিমে খেলব, কাদের বিরুদ্ধে খেলব, কিছুই জানি না।'

'জানতে হবে না। শোন, তোকে আর একটা কথা বলি। এই যে আমাদের টাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারজন্যে তো দলের দুটো রেগুলার প্লেয়ারকে তো বসতে হয়েছে। এই ব্যাপারটা অনেকের ভাল নাও লাগতে পারে। ওরা চেষ্টা করবে তোকে বেকায়দায় ফেলতে। যে বলে রান নেই সেই বলে রান নিয়ে তোকে রানআউট করে দেবে।'

'এতে তো ওদের টিমের ক্ষতি।'

'হোক। বোঝাতে চেষ্টা করবে বাইরে থেকে ভূষিমাল এনেছে টাকা খরচ করে। আমার বেলায় ক্যাচ ছাড়বে না তবে দু-চারটে বেশি বাউন্ডারি হয়ে যেতে পারে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার এর আগেও হয়েছে। চুরি করে সিঙ্গল নিতে যাবি না।' সুব্রত সিরিয়াস হয়ে বোঝাল।

স্বপ্নাশিষের চোখ বারংবার তার দিকে চলে যাচ্ছিল। আচ্ছা, এই মেয়ে কি কাউকে চিঠি লেখে মাই ডার্লিং বলে! মেয়েরা বেশি সুন্দর হলে অল্প বয়সেই প্রেমিক তৈরি হয়ে যায়। নিশ্চয়ই এই মেয়ের কেউ না কেউ আছে। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল।

সুব্রত বলল, 'দমদম এসেছে।'

'কতক্ষণ লাগবে ?'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'আমরা যেখানে নামব তার পরেও ট্রেন যাবে ?'

'হ্যাঁ। নৈহাটিতে গিয়ে থামবে। তুই আজ ওপেন কর দেখবি বেঙ্গল টিমে চান্স পেয়ে যাচ্ছিস। হরিমাধবদা কেন খুব আশা করছে তুই বেঙ্গল টিমে থাকবি।'

সুব্রতর কথা শেষ হওয়ামাত্র স্বপ্নাশিষ দেখল রোদচশমা এদিকে ফিরল। কী কাণ্ড! মেয়েটা তাকে দেখছে। সেটা লক্ষ করে সুব্রত বলল, 'রঞ্জিতে যদি কয়েকটা সেঞ্চুরি করতে পারিস তা হলে ইন্ডিয়া টিমে

ঢুকে যেতে পারবি। কে বলতে পারে দুবছর বাদে লোকে শচীনের মতো তোর নাম করবে কিনা!'

'ভ্যাট।' স্বপ্নাশিষের মুখ থেকে শব্দটা ছিটকে বের হল। সেইসঙ্গে মুখে রক্ত জমল। মাঝেমাঝেই কল্পনায় সে এমন ছবি আঁকে, একদিন স্বপ্নও দেখেছিল, কিন্তু সুব্রতর মুখে শোনা মাত্রই অসম্ভব বলে মনে হল। অনেকদিন একা হাঁটতে হাঁটতে সে যে ছবিটা এঁকেছে তা এইরকম, রঞ্জিতে কয়েকটা সেঞ্চুরি করে ফেলার সুবাদে সে ইন্ডিয়া টিমে চান্স পেয়েছে। ইন্ডিয়া ভার্সেস অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া দুশো ষাট তুলেছে পঞ্চাশ ওভারে। স্বপ্নাশিষ ওপন করেছিল। কিন্তু মাত্র পনেরো ওভারে পাঁচ উইকেট চলে গিয়ে ইন্ডিয়ার ত্রিশ রান। সবাই বুঝে গিয়েছে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। হঠাৎ তার মন শক্ত হল। মনে মনে বলল, জাগো বাঙালি। ওয়ার্ন বল করতে আসছে, সোজা মাথার ওপর দিয়ে ছয়। লেগ অফ দিয়ে পর পর চারটে চার, শেষ বলে এক নিয়ে উল্টোদিকের উইকেটে গিয়ে নেক্সট ওভার ফেস করল সে। এক ওভারে তেইশ রান। বাইশ ওভার বাকি থাকতে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে সে বেরিয়ে আসছে মাঠ থেকে ব্যাট উঁচু করে। সে জানে এ সবই স্বপ্ন, কিন্তু স্বপ্নটাকে দেখতে ভারী ভাল লাগে।

একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। ব্যারাকপুরে এসে থামতেই মেয়েটা নড়েচড়ে উঠল। স্বপ্নাশিষের খুব খারাপ লাগছিল, মেয়েটা নিশ্চয়ই নেমে যাবে এখানে। কিন্তু ও নামল না। মাঝে মাঝে বাইরের প্রকৃতি দেখছে, আবার ভেতরেও নজর রাখছে। রোদ চশমার জন্যে ওর চোখ দেখা যাচ্ছে না, এই মুশকিল।

হঠাৎ উল্টোদিকে বসা এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা ক্রিকেট খেলো?'

সুব্রত মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'শ্যামনগরে যাচ্ছ?'

'আপনি জানেন ওখানে খেলা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। খুব পুরনো টুর্নামেন্ট। আমরা যখন রঞ্জি খেলতাম তখন অবশ্য এতসব টুর্নামেন্ট ছিল না। কলকাতার বাইরে খেলতে গেলে তো তোমরা টাকা নাও?'

'দিলে নিই।' সুব্রত বলল, 'ও অবশ্য এই প্রথম যাচ্ছে। কোনওদিন টাকা নেয়নি। আপনি কবে রঞ্জি খেলতেন? পঙ্কজ রায়ের সময়ে?'

'না না। তারও আগে। লিগে খেলো?'

'হ্যাঁ। ওর এবার বেঙ্গল খেলার সম্ভাবনা আছে।'

বৃদ্ধ তাকালেন স্বপ্নাশিষের দিকে, 'তা হলে আরও পরিশ্রম করো। এই যে উৎপল চ্যাটার্জি, কত পরিশ্রম করেছে বলেই তো তিরিশ বছর বয়সে সুযোগ পেল, আমি ওর কাছে বেশি আশা করি না। এখন ষোলো সতেরোতে একটা প্লেয়ার তৈরি হয়ে যায়। তোমাদের বয়সে তো চুটিয়ে খেলা উচিত।'

এমন সময় মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। চলন্ত ট্রেনে ব্যালান্স রাখতে রাখতে এগোল দরজার দিকে। বৃদ্ধ বললেন, 'তোমরা বসে আছ কেন? শ্যামনগর এল বলে।'

ওরা ঝটপটিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্বপ্নাশিষ দেখল মেয়েটি গম্ভীর ভঙ্গিতে নেমে গেল প্লাটফর্মে। ওরা নামতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কত দূরে মাঠ?'

সুব্রত বলল, 'আমি জানি না। ভেবেছিলাম বাবলু আসবে আমাদের নিতে। প্রথমে মামার বাড়িতেই যেতে হচ্ছে।'

'বাবলুটা কে?'

'আমার মামাতো ভাই।'

কিন্তু বাবলুর দর্শন পাওয়া গেল। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে স্টেশনে। সুব্রত পরিচয় করিয়ে দেবার পর বাবলু তাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। স্বপ্নাশিষ দেখল বাবলুর কথা শুনে সুব্রত মাথা নাড়ছে খুব। শেষপর্যন্ত অনুরোধে ঢেঁকি গিলল।

রিকশায় বসে সুব্রত বলল, 'নিজের মামাতো ভাইকেও বিশ্বাস করা যায় না।'

'কেন? কী করেছে?'

'বলছে চারশো টাকার বেশি দিতে পারবে না। ভেবেছিলাম ফিরে যাব, তারপরে মনে হল তাতে কী লাভ হবে। দিনটা নষ্ট করার চেয়ে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই নেওয়া যাক। তুই আড়াই নিস আমি দেড় নেব। ঠিক আছে?' সুব্রত বলল।

'যা দেবে ফিফটি ফিফটি হবে।'

সাইকেলে চেপে বাবলুরা আগে আগে যাচ্ছিল। হঠাৎ স্বপ্নাশিষ মেয়েটাকে দেখতে পেল। রাজেন্দ্রাণীর মতো রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেছে। পাশ দিয়ে রিকশাটা যখন যাচ্ছিল তখন সে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে মেয়েটি মুখ তুলল। এখন ওর চোখে রোদ চশমা নেই, চোখ দুটো আশ্চর্য সুন্দর। ওই চোখের দিকে তাকালে আয়ু এক কোটি বছর বেড়ে যায় অনায়াসে। কিন্তু এই মেয়ে কি হাসতে জানে না। মুখে কোনও ভাঁজ পড়ল না স্বপ্নাশিষকে দেখেও। রিকশাটা বেশ কিছুটা পথ

চলে এলে সুব্রত বলল, 'তোর এই এই দোষ ছিল না।'

'কী দোষ ?'

'পটেটোর।'

'ভাগ্।'

'মফস্বল শহরের মেয়েদের দিকে ওভাবে তাকাস না। এখানকার লোক বাইরের মানুষকে মনে মনে অপছন্দ করে। অন্তত নিজেদের মেয়েদের ব্যাপারে— !'

'তুই চুপ কর।'

২

স্বপ্নাশিষ যা ভেবেছিল তা নয়। কাজের দিন হলেও প্রচুর দর্শক মাঠে। দুদিকে সামিয়ানা টাঙিয়ে টেন্ট হয়েছে। বেশ কিছু বয়স্ক মানুষ খেলা নিয়ে রীতিমতো সিরিয়াস। আলাপটালাপ হওয়ার পর সে তার দলের ক্যাপ্টেনকে লক্ষ করছিল। গাওস্কর গাওস্কর ভাব। টসে হেরে ফিল্ডিং নিতে বাধ্য হতে ওরা মাঠে নামল। মাঠের দুপাশ দিয়ে রাস্তা, বাড়ি। সুব্রত ভাল বল করেছে। তবু তিরিশ ওভারে একশ আশি রান তুলে ফেলল বিপক্ষদল। ওরা নাকি তিনজন সিনিয়র ডিভিসনের খেলোয়াড় এনেছে।

লাঞ্চে সুব্রত বলল, 'কীরে, পারবি তো ?'

স্বপ্নাশিষ খিঁচিয়ে উঠল, 'ক্রিকেট কি একজনের খেলা ? তুই তো ভাল বল করলি, পারলি ওদের রান রুখতে ! কম করে পঞ্চাশ রান বেরিয়ে গেছে ফিল্ডিং-এর দোষে।'

গাওস্কর একজন প্রৌঢ়র সঙ্গে এগিয়ে এল, 'আমাদের আস্কিং রেট ছয়। অর্থাৎ পার বল এক রান। একদম ঠুকে খেলা চলবে না। প্রথম থেকেই অলআউট যান। আপনি তো ওপন করবেন ? কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

ইনিংস শুরু করতে নামল স্বপ্নাশিষ। ব্যাট হাতে যেতে যেতে সঙ্গীকে বলল, 'আমি কল না দিলে আপনি রান নেবেন না। অন্তত প্রথম কয়েকটা ওভার ধরে খেলতে চাই।'

'ক্যাপ্টেন বলেছে অলআউট যেতে। কথা না শুনলে পরের ম্যাচে বসিয়ে দেবে।'

ছেলেটির কথা শুনে কাঁধ নাচাল স্বপ্নাশিষ। কিছু বলার নেই। ছেলেটাই শুরু করল। প্রথমেই দুই রান। দ্বিতীয় বলে এল বি ডব্লু।

সমস্ত মাঠ চুপচাপ, শুধু ফিল্ডাররা নাচছে। প্রথম ডাউন এসেই একটা রান নিল। চতুর্থ বল ফেস করার আগে মাঠ দেখে নিল স্বপ্নাশিষ। এবং তখনই চোখে পড়ল তাকে। বোলারের পেছন দিকের বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। এতক্ষণ সে ফিল্ড করেছে কিন্তু ওই বাড়ির দিকে তাকায়নি। গুড লেংথ বল মাঝ ব্যাটে রাখল সে। বাকি দুটো চমৎকার ঠেকিয়ে দিল। মনে মনে ঠিক করল আউট হবে না এবং যতক্ষণ পারে উইকেটের এই এন্ডেই থাকবে। এদিকে থাকলে ওকে দেখা যাবে।

তিন ওভারে দশ রান উঠতেই চিৎকার শুরু হল। দর্শকরা চেঁচাচ্ছে, গাওস্করও। আট রান করে ছয় মারতে গিয়ে লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে ওয়ান ডাউন ফিরে যেতে নতুন ব্যাটসম্যান এসে তাকে বলল, 'দেবীদা বলছেন মেরে খেলতে। এ ভাবে খেললে টিম হেরে যাবে।'

'তাই বলে সুইসাইড করতে হবে নাকি।'

'দেখুন ! টিম না জিতলে আপনাদের পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা হবে।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল স্বপ্নাশিষের। ইচ্ছে করছিল এখনই মাঠ ছেড়ে চলে যেতে। হরিমাধবদা কেন খেপ খেলার বিরোধী তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মাঠ ছেড়ে গেলে বিশেষ একজন দর্শক কী ভাববে তাকে ? স্বপ্নাশিষ মুখ তুলল। যাঃ, মেয়েটা ব্যালকনিতে নেই।

ফুলটস বল দেখে সজোরে ব্যাট চালাল স্বপ্নাশিষ। মিড অন দিয়ে সোজা ছয়। হাততালি পড়ছে খুব। এবার গুড লেংথ পড়ছে দেখে এগিয়ে গেল সে। ঠিক যেভাবে হরিমাধবদা বলেছিলেন সেইভাবে বলটাকে ফুলটস করে নিয়ে মারতেই আবার ছয়। এবার উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল। স্বপ্নাশিষ দেখল, সম্ভবত চিৎকার শুনেই মেয়েটি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। দুটো ছয় খেয়ে বোলার সম্ভবত ক্ষিপ্ত হয়েছিল। শর্ট পিচে প্রচণ্ড জোরে ঠুকল বলটাকে। পিচে পড়েই তীব্র গতিতে বলটা উঠে এল মাথা লক্ষ করে। পা মুড়ে শরীর ছোট করে হুক করল স্বপ্নাশিষ। বলটা আকাশে উঠে যাচ্ছে। ফিল্ডাররা ছুটে যাচ্ছে ক্যাচের আশায়। সে ব্যালকনির দিকে তাকাতেই দেখল মেয়েটি বল দেখছে। যেন তার চোখের আকর্ষণে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বলটা বাউন্ডারির বাইরে চলে গেল। তিন বলে আঠারো রান। সমস্ত চিৎকার ছাপিয়ে দেবুদা নামক প্রৌঢ়টির গলা ভেসে এল, 'চালিয়ে যাও ব্রাদার।'

হঠাৎ মনে পড়ল রবি শাস্ত্রী এক ওভারে ছটা ছক্কা মেরেছিল। তার চেষ্টা করতে দোষ কী ! চতুর্থ বলটা বাউন্ডারি হয়ে গেল। এক ওভারে বাইশ। বোলারের সঙ্গে ওদের ক্যাপ্টেন আলোচনা করছে। ফিল্ডারদের

ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মাঠের চারপাশে। স্বপ্নাশিষ প্রচণ্ড জোরে ব্যাট চালাতে বল বোলারের মাথার ওপর দিয়ে বুলেটের মতো ছুটে গেল। মাঠ পেরিয়ে সোজা নির্দিষ্ট বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে আছড়ে পড়ল সেটা। হৈ হৈ চিৎকারের মধ্যে সে মেয়েটিকে মুখে হাত চেপে বসে পড়তে দেখল। পাঁচ বলে আঠাশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

বেশ কিছু লোক মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কয়েকজন বাড়িটার সামনে গিয়ে জানতে চাইল মেয়েটা কতখানি আহত। স্বপ্নাশিষ ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। বিপক্ষ দলের কয়েকজন তেড়ে এল, 'জেনেশুনে মেরেছে। তখন থেকে লক্ষ করছিলাম বারংবার ওই দিকে তাকাচ্ছে। ওর যদি কিছু হয় তা হলে জ্যান্ত কবরে যেতে হবে তোমাকে।'

এইসময় আর একটা দল মাঠে ঢুকল যাদের নায়ক গাওস্কর, দেবীদা। সুব্রতকেও ওই দলে দেখা গেল। দেবীদা চিৎকার করছিলেন, 'হচ্ছেটা কী ? অ্যাঁ ? হেরে যাবে বুঝে খেলা ভণ্ডুল করে দেবার মতলব। এ আমি হতে দেব না। আম্পায়ার কোথায় ? এই যে মশাই, খেলা আরম্ভ করুন। আপনাদের কোনও ভয়েস নেই ?'

আম্পায়ার দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাণ্ডব দেখছিলেন, 'পুলিশের অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই, ভিড় সরাবে কে ? আপনারা মাঠ থেকে পাবলিক বের করে দিন আমরা খেলা শুরু করছি।'

সুব্রত চলে এসেছিল পাশে। চেঁচিয়ে বলল, 'ভয় পাস না।'

'আশ্চর্য ! আমার কী দোষ বল তো ?'

'দোষ নেই, তবে অত জোরে না মারলেই পারতিস। মেয়েটা বোধহয় এ পাড়ার নায়িকা তাই কিছু পাবলিক খেপে গিয়েছে।' সুব্রত মন্তব্য করল।

ইতিমধ্যে জনতার কেউ উইকেট তুলে নিয়েছে। তার পেছনে একদল ধাওয়া করল। আর তারপরেই ঢিল পড়তে লাগল। দেবুদা ওদের সরিয়ে নিয়ে গেল সামিয়ানার নীচে। এবং তখনই পুলিশের জিপ এসে হাজির হল। সঙ্গে সঙ্গে জিপটাকে ঘিরে এইসব শব্দাবলী বর্ষিত হতে লাগল, 'মেরে ফেলেছে, অ্যাটেম্প টু মার্ডার, ইচ্ছে করে মেরেছে, ওদের সাপোর্টার না বলে প্ল্যান করে মেরেছে। কক্ষনও নয়। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। বাউন্ডারির বাইরে বা ভেতরে বল কারও শরীরে লাগলে ব্যাটসম্যান দায়ী নয়।

স্বপ্নাশিষ নার্ভাস হয়ে গেল। পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত সে শক্ত ছিল। এখন পুলিশ যদি তাকে অ্যারেস্ট করে তা হলে বেঙ্গল টিমে চান্স

www.Murchona.com

পাওয়া তো দূরের কথা তাকে পিতৃদেব বাড়িতে ঢুকতে দেবেন কিনা সন্দেহ। এমন ঘটনার কথা কাগজে বের হবেই এবং হরিমাধবদা জানতে পারলে তার ক্রিকেট-জীবন খতম।

স্বপ্নাশিষ ভাবল এই ভিড়ভাট্টার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যদি ওরা দেখতে পায় তা হলে পিছু ধাওয়া করে গণধোলাই দেবে। এখানকার রাস্তাঘাটও তো সে ভাল করে চেনে না। ট্রেন ছাড়া ফেরার কি অন্য কোনও উপায় আছে? এইসময় একজন এস আই জিপ থেকে নেমে সামিয়ানার নীচে এলেন, 'ব্যাটসম্যান কে ছিলেন?'

স্বপ্নাশিষ জবাব দেবার আগেই দেবুদা বললেন, 'কেন? কে ব্যাটসম্যান সেটা কোনও কথা নয়। খেলাটা ক্রিকেট। একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে খেলতে হয়। আর সেটা করতে গিয়ে বল মাঠের বাইরে গিয়ে কাউকে আঘাত করেছে। এজন্যে দায়ী ওই ক্রিকেট খেলাটাই, কোনও ব্যাটসম্যান নয়।'

এস আই বললেন, 'সেটা বেশ বুঝতে পারছি তবে এই যুক্তি টিকবে না যদি উল্ডেড পার্শেনের কেউ আমাদের কাছে ডেফিনিট কমপ্লেন করে। আপনারা কেউ এখান থেকে যাবেন না, আমি যতক্ষণ ওই বাড়ি থেকে ঘুরে না আসছি।' এস আই এগিয়ে গেলেন।

সুব্রত দেবীদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার টিম কি লোকাল টিম নয়?'

'তাতে কী হয়েছে? ওরাও বিদেশি নয়। ঝামেলা পাকিয়ে দিলে সবাই মজা পায়। যারা মজা পেতে চেয়েছে তারা খেলা ভণ্ডুল করে ওদের বাঁচিয়ে দিল।'

গাওস্কর বলল, 'কিন্তু আমাদের তো কোনও দোষ নেই। আম্পায়ার রিপোর্ট দিলে টুর্নামেন্ট কমিটি নিশ্চয়ই আমাদের উইনার ডিক্লেয়ার করবে।'

দেবুদা মাথা নাড়ল, 'না। খেলা ভণ্ডুল হলে রিপ্লে হবে যদি কোনও দল অন্তত পনেরো ওভার খেলার সুযোগ না পায়। কিন্তু ভাই, কী নাম যেন— !'

সুব্রত মনে করিয়ে দিল, 'স্বপ্নাশিষ।'

'হ্যাঁ, স্বপ্নাশিষ ! আমি লক্ষ করছিলাম তুমি ওই বোলার এন্ডে থাকাটা পছন্দ করছ আর প্রতিটি বলে হিট করার আগে ওপরের দিকে তাকাচ্ছিলে। কারণটা কী?'

পাশ থেকে সুব্রত ঝটপট জবাব দিল, 'ওটাই ওর মুদ্রাদোষ।'

'হরিমাধব শুধরে দেয়নি? ওর মতো লোক এটা অ্যালাউ করছে?

আশ্চর্য !'

স্বপ্নাশিষের বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল। এই উদ্যোক্তাটিও জানে সে কার শিষ্য ? হয়ে গেল। সুব্রতর ওপর বেজায় রাগ হচ্ছিল তার। এইসময় দুজন মধ্যবয়স্ক মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল এদিকে। তাঁদের দেখেই গম্ভীর হয়ে গেল এদের সবাই।

কাছে এসে ওঁদের একজন বললেন, 'ব্লাড দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি বাচ্চারা, বুঝতেই পারছ। যা হবার তা তো হয়েছে। দেবু, ব্যাপারটা ভুলে যাও।'

দেবুদা চিৎকার করলেন, 'ব্লাড দেখে ? মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্যালকনির কোন মেয়ের শরীর থেকে ব্লাড বের হচ্ছে তা বুঝল কী করে তোমাদের প্লেয়াররা ? ইয়ার্কি মারতে এসেছ ? এর নাম ক্রিকেট ?'

একজন বলল, 'দেখো ভাই, বল গিয়ে ডাইরেক্ট হিট করেনি। দেওয়ালে ধাক্কা লেগে গায়ে লেগেছে। নইলে মার্ডার কেসে পড়ে যেতে।'

'মার্ডার কেস আমাকে দেখিও না। ব্যাটসম্যানের হিটে কেউ মারা গেলেও কেস হবে না।'

'বাঃ। ব্যাটসম্যান যদি তার শত্রুকে আহত করবে প্ল্যান নিয়ে হিট করে তা হলে ক্রিকেটের দোহাই দিয়ে বেঁচে যাবে ?' লোকটি প্রতিবাদ করল।

'দেখো, কোনও ব্যাটসম্যান যদি মাঠের বাইরে ব্যালকনিতে বসে থাকা কাউকে খেলা চলার সময় প্ল্যান করে হিট করতে পারে তা হলে তাকে আমি মাথায় তুলে নাচব। পৃথিবীতে এমন ব্যাটসম্যান খুব কমই আছে। যাক গে, কী বলতে এসেছ ?'

'আজ আর খেলা আরম্ভ করা যাবে না। এসো আমরা একসঙ্গে রিপ্লের জন্যে বলি। তবে ওই ভাড়াটে প্লেয়ারকে দলে রেখো না।'

'কাকে রাখব সেটা আমি বুঝব। কেন, তোমার দলে ভাড়াটে নেই ?'

'কিন্তু ওকে দেখলেই পাবলিক সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাবে।'

'না। তুমি ভয় পাচ্ছ ও খেললে তোমার টিম হেরে যাবে।'

এইসময় এস আই ফিরে এলেন, 'কোনও কারণ ছাড়াই আপনারা দক্ষযজ্ঞ বাধালেন। মেয়েটি সামান্য আহত হয়েছে এবং কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেনি। অতএব—। যাক গে, খেলা তো আজ হচ্ছে না, তা হলে ভিড় হঠান। যান, যে যার কাজে চলে যান।' শেষের কথাগুলো জনতার উদ্দেশে বলে জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন এস আই।

দেবুদার ক্লাব তাদের সরঞ্জাম প্যাক করছিল। খেলোয়াড়রা চলে যাচ্ছে যে যার বাড়ি। সুব্রত বাবলুকে ফিসফিস করে কিছু বলতেই বাবলু দেবুদার কাছে গেল। দেবুদা কী ভেবে পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে সুব্রতর দিকে এগিয়ে গেলেন, 'অন্য কেউ হলে এক পয়সাও দিত না। আমি দিচ্ছি। হাজার হোক তোমরা নিজের পয়সায় ট্রেনের টিকিট কেটে এখানে এসেছ। তাই যা খরচ করেছ তার অনেক বেশি দিচ্ছি।'

সুব্রত বলল, 'সেকী ! প্রথমে কথা হয়েছিল আপনারা পাঁচ দেবেন। পরে বাবলু বলল এক কম হবে। চারশোর বদলে পঞ্চাশ দিচ্ছেন ?'

'চারশোই দিতাম যদি খেলাটা শেষ হত। রিপ্লে হবে, আবার এই ম্যাচের জন্যে আমাকে খরচ করতে হবে। এক জিনিসের দাম দুবার দেওয়া যায় না।'

'খেলা বন্ধ হবার জন্য আমরা দায়ী নই। আমাদের যা দেবেন বলে এনেছেন তা দিতে হবে। পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা করবেন না।'

দেবুদা হাসলেন, 'খেলা বন্ধ হবার জন্যে তোমার বন্ধু দায়ী। আমি ছিলাম বলে ও প্রাণে বেঁচে গেল। কোথায় সেই কারণে কৃতজ্ঞ হবে তা নয় আবার চোখ রাঙাচ্ছ। কী, বাবলু, ওদের একটু বুঝিয়ে বল।' দেবুদা সামনে থেকে সরে গেলেন।

সুব্রত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু স্বপ্নাশিষ তাকে বাধা দিল, 'ছেড়ে দে।'

'ছেড়ে দেব মানে ? তুই জানিস না, কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে টাকা মেরে দেওয়া হয়।'

'তা হলে ডাকলে আসিস কেন ? চল, ফিরে যাই।'

বাবলু বলল, 'সুব্রতদা, বাবা তোমাকে বাড়ি ঘুরে যেতে বলেছে।'

'আজ সম্ভব নয়। মেজাজ ভাল নেই।'

অনেকক্ষণ ধরে সাহস হচ্ছিল না বলে স্বপ্নাশিষ ব্যালকনির দিকে তাকায়নি। মাঠ ছেড়ে আসার সময় সে আড়চোখে তাকাল। ব্যালকনি ফাঁকা, বাড়ির সামনেও ভিড় নেই।

বাবলুরা ওদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। নৈহাটি লোকালে বসে স্বপ্নাশিষের মনে হল এ-ভাবে চলে আসা ঠিক হল না। ট্রেন তখন কাঁকিনাড়া ছাড়িয়েছে। সে বলল, 'আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, ইস্।'

সুব্রত অবাক হল, 'কার কাছে ক্ষমা চাইবি ?'

'ওই যে, যে আহত হয়েছে আমার জন্যে। এটা তো মিনিমাম

ভদ্রতা।'

'রাখ। চিনি না জানি না, ক্ষমা চাইতে গেলে অপমান করতে পারত।'

'না। আমার তা মনে হয় না। দেখে খুব মার্জিত ভদ্র বলে মনে হয়েছে।'

'তুই পিচে দাঁড়িয়ে দূরের ব্যালকনির একটা মেয়ের মধ্যে অত গুণ আবিষ্কার করলি?'

'বাঃ, পিচে দাঁড়িয়ে কেন হবে? আমরা তো একসঙ্গে ট্রেনে ফিরেছিলাম।'

'অ্যাঁ? মাই গড।' লাফিয়ে উঠল সুব্রত, 'সেই মেয়েটা নাকি?'

স্বপ্নাশিষ বিমর্ষ মুখে তাকাল। সেটা লক্ষ করে সুব্রত বলল, 'কথাটা আগে বললি না কেন, তা হলে না হয় একটা চেষ্টা করা যেত। ভুলে যা, এরকম কত কেস আসছে যাবে, কোথায় কলকাতা আর কোথায় শ্যামনগর। ছোঃ।'

সুব্রত তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল কিন্তু স্বপ্নাশিষ মাঠে চলে এল। এখনও সন্ধে হয়নি। প্র্যাকটিস শেষ করে হরিমাধবদা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?'

'এলাম।' স্বপ্নাশিষ কোনওমতে বলল। কথাটা কী করে জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে, অথচ না জানিয়ে উপায় নেই এটা বুঝতে পারছিল।

'কেমন আছেন সুব্রতর মাসি?'

স্বপ্নাশিষ হাসার চেষ্টা করল। যে হাসির কোনও অর্থ নেই।

অন্যদের সঙ্গে কথা শেষ করার আগে ক্লাবের এক কর্তা এসে বললেন, 'স্বপ্ন আজ তোমার বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। আমাকে একটু কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল—।'

'ও। কিন্তু তোমার বাবা কি চান না যে তুমি খেলাধুলা কর?'

'ঠিক তা নয়—।'

'যাক গে, তোমার জন্যে কিছু জিনিস রয়েছে, ক্লাব থেকে নিয়ে যেয়ো।'

'কী জিনিস?'

'খুব সামান্য। নিজেই দেখো।' ভদ্রলোক চলে গেলেন।

অন্যদের সঙ্গে কথা শেষ করে হরিমাধবদা সামনে এলেন, 'কিছু

বলবি ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি রাগ করতে পারবেন না।'

'আশ্চর্য ! রাগ করার মত কিছু হলে আমি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকব ? কি ব্যাপার ?'

'আমি সুব্রতর মাসিকে দেখতে যাইনি। ওর কোনও মাসি নেই।'

'তা হলে ?' হরিমাধবদা অবাক।

'সুব্রতর সঙ্গে শ্যামনগরে গিয়েছিলাম। সুব্রত ওর মামাতো ভাইকে কথা দিয়েছিল বলে আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল তিরিশ ওভারের ম্যাচ খেলতে।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন হরিমাধবদা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা পেলি ?'

'টাকা পাইনি। ম্যাচ ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল।' কোচের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না।

সে কিন্তু কথাটা বলে ফেলে যেন বেঁচে গেল।

'তুই আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করলি স্বপ্ন ?'

'বিশ্বাস করুন, আজ সকালের আগে আমি জানতাম না।'

'আমি তোদের বলিনি ওসব খেপ খেলতে কখনও যাবি না ?'

'আমি কখনও খেলিনি। কখনও খেলব না।'

'কী করে বিশ্বাস করি। আগামীকাল ম্যাচ। আজ খেপ খেলতে গিয়ে তুই আহত হতে পারতিস। বিকেলে টিমের সবাই এল শুধু তোরা দুজন এলি না। কী ভেবেছিস ? তোদের ছাড়া টিম চলবে না ? সি এ বি-তে একটু আধটু তোদের কথা হচ্ছে শুনেই ধরাকে সরা ভেবেছিস ? না, তোদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কোনও লাভ নেই।' হরিমাধবদা ঘুরে দাঁড়ালেন।

ছুটে এসে ওঁর হাত ধরল স্বপ্নাশিষ, 'মাপ করে দিন, প্লিজ। আমি জানতাম ও মাসিকে দেখতে যাবে। সকালে আপনি চলে যাওয়ার পর ম্যাচের কথা জানতে পারলাম।'

'নিজে দোষ করে এখন বন্ধুকে ফাঁসাচ্ছিস ?'

ঢোক গিলল স্বপ্নাশিষ। ব্যাপারটা তো তাই। কিন্তু সে তো মিথ্যে বলছে না।

হরিমাধবদা হাঁটছিলেন মাঠের মাঝখান দিয়ে। স্বপ্নাশিষ পাশে চলছিল। বিড়বিড় করছিলেন হরিমাধবদা, 'সিনসিয়ারিটি নেই, এখন থেকেই তোরা ডিজঅনেস্ট ! এত টাকার দরকার ? তোর তো অবস্থা খারাপ নয়। তবু খেপ খেলতে গেলি ! একজন প্লেয়ারের অহঙ্কারবোধ

থাকা দরকার। খেলা ভণ্ডুল হল কেন ?'

শেষ প্রশ্ন এমন আচমকা যে উত্তর দিতে গিয়ে কথা খুঁজতে হল, 'মানে, আমি ছয় মেরেছিলাম, বলটা উঠে গেল ওপরে, গিয়ে একটি মেয়ের গায়ে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই হৈ হৈ করে মাঠে ঢুকে পড়ল।'

'আশ্চর্য ! ছয় কেউ দেখেশুনে উন্ডেড করবে বলে মারতে পারে না। তোর টিমের অন্য সবাই প্রতিবাদ করল না ? নাকি টিম হারছিল ?'

'আমরাই ভাল পজিশনে ছিলাম। দেবুদা, মানে টিমের ম্যানেজার প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু তবু খেলা হয়নি।'

'দেবুদা ? শ্যামনগরের দেবু দত্ত ?'

'টাইটেল জানি না তবে আপনাকে চেনে।'

'বাঃ। সুনাম বাড়িয়ে এসেছ। মেয়েটা কেমন আছে ?'

'দেখিনি।'

'দেখিসনি ? তোর হিটে যে মেয়েটা উন্ডেড হল সে কেমন আছে তা না দেখে চলে এসেছিস ? তোদের কি সৌজন্যবোধও নেই ? ছি ছি।' হরিমাধবদা খেপে গেলেন, 'পশুর মতো কাজ করেছিস। কালই গিয়ে খোঁজ নিবি।'

'কাল তো ম্যাচ।'

'নো। এই ম্যাচে তুমি খেলছ না। পানিশমেন্ট। তোমার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে সুব্রত দুটো ম্যাচে বসবে।' হনহন করে এগিয়ে গেলেন হরিমাধবদা।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ উপচে জল গড়িয়ে এল। প্রথমে সুব্রত তার পরে হরিমাধবদার ওপর রাগ হল ওর। সুব্রত অহেতুক ঝুঁকি নিয়েছিল কিন্তু হরিমাধবদার কাছে সব কথা খুলে বলার পরও তিনি তাকে শাস্তি দিলেন। অন্যায় করে স্বীকার করলে ক্ষমা করতে পারা যায় না ? সে যদি না বলত তা হলে আগামীকালের ম্যাচে অনায়াসেই খেলতে পারত। বড় ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচ, একটা সেঞ্চুরি করতে পারলেই সি এ বি-র ভাল নজর পড়ত। এইসব ম্যাচের দিকেই ওরা তাকিয়ে থাকে। সুযোগটা হাতছাড়া হওয়া মানে অনেক পিছিয়ে যাওয়া।

ক্লাবে প্লেয়ার লিস্ট তৈরির ব্যাপারে হরিমাধবদাই শেষ কথা। তিনি অন্য কিছুতে নাক গলান না, ক্লাব রাজনীতিতে থাকেন না। কিন্তু কাকে কোন ম্যাচে খেলাবেন সে ব্যাপারে কোনও অনুরোধে কান দেন না। কী করা যায়। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল স্বপ্নাশিষ, এমন সময় কেউ তার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল। সে দেখল ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে মালি

হাত নাড়ছে। কাছে যাওয়া মাত্র মালি বলল, 'তোমাকে সেকেটারিবাবু ডাকছে।'

স্বপ্নাশিষের খেয়াল হল। বাড়ি যাওয়ার আগে তাকে দেখা করে যেতে বলা হয়েছিল। ওদের ক্লাবের সেক্রেটারির নাম সুনীল চ্যাটার্জি। এককালে ক্রিকেট খেলতেন এখন নামকরা উকিল। ভেতরে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে সুনীলবাবু বললেন, 'ওই প্যাকেটটা তোমার জন্যে।'

'কী আছে?'

'বাড়িতে গিয়ে দেখো।' সুনীলবাবু হাসলেন।

স্বপ্নাশিষ প্যাকেটটা নিল, বেশ ভারী। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দ্রুত পা চালিয়ে বাড়িতে পৌঁছাতেই চারপাশে আলো জ্বলে উঠল। পিতৃদেব বসে আছেন বাইরের ঘরে। দেখামাত্র প্রশ্ন ছুটে এল, 'রাজকার্য শেষ হল?'

স্বপ্নাশিষ দাঁড়াল। এর উত্তর তার জানা নেই।

'কোথায় ছিলে সারাদিন?'

'খেলা ছিল।'

'শোনো। তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খেলবে না পড়বে?'

'দুটোই।'

'দুই নৌকোয় পা রাখলে কি হয় তা জানো না? খেলে কি হাতিঘোড়া হবে? কলকাতায় খেলে কেউ তেণ্ডুলকার হয় না। চাকরি বাকরি পাবে?'

'পেতে পারি।'

'হাতে ওটা কী?'

'ক্লাব থেকে দিয়েছে। খুলে দেখিনি।'

'খোলো।'

অতএব প্যাকেট খুলতে হল। প্রথমেই বের হল একজোড়া জুতো। তার মাপের। বেশ হালকা এবং দামি, দৌড়াতে আরাম লাগল। সেইসঙ্গে দুজোড়া মোজা।

'হোয়াট ইজ দিস?'

'স্পোর্টস স্যু।'

'ক্লাব তোমাকে জুতো দিল কেন?'

'জানি না। আমি দিতে বলিনি।'

'তোমার খেলার জুতো নেই?'

'আছে। তবে অবস্থা ভাল নয়।'

'জুতো দান নেওয়া কখনও উচিত নয়। তবে নিয়ে নিয়েছ যখন তখন আর কী করা যাবে। যাও তোমার দাদাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

ভেতরে ঢুকে যেন বেঁচে গেল স্বপ্নাশিষ। দেবাশিষের ঘরের দরজায় পৌঁছে দেখল সে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে। কোনও কোনও ছেলেকে দেখলেই বোঝা যায় ভাল ছাত্র, দেবাশিষ ঠিক সেই ধরনের। স্বপ্নাশিষ বলল, 'দাদা, তোকে বাবা ডাকছেন।'

দেবাশিষ ঘাড় ফিরিয়ে ভাইকে দেখল, 'ওগুলো কী ? কিনলি ?'

'টাকা কোথায় পাব ? ষাট টাকায় চলে যে এগুলো কিনব। ক্লাব থেকে দিয়েছে আর তাতেই বাবা খেপে গিয়েছেন।' স্বপ্নাশিষ বিরক্ত হয়ে বলল।

দেবাশিষ উঠে এল, 'ঘাবড়াস না। তুই একবার রঞ্জি খেললেই দেখবি সবকিছু বদলে যাবে। ছেলের নাম হলে সব বাবাই খুশি হয়। কী মনে হয়, এবার ডাক পাবি ?'

'জানি না।' হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যাওয়াতে স্বপ্নাশিষ নিজের ঘরে চলে এল। হরিমাধবদা কালকের ম্যাচে খেলাবেন না অথচ ক্লাব তাকে এ-সব দিল ! সুনীলদা নিশ্চয়ই জানেন না তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার জুতোর কথা নিশ্চয়ই সুনীলদার কানে হরিমাধবদাই তুলেছেন। অন্যায় সে নিশ্চয়ই করেছে কিন্তু শাস্তিটা একটু বেশি হয়ে গেল না ? এই কারণে সে সামনের বার ক্লাব ছেড়ে অন্য ক্লাবে জয়েন করতে পারে। ব্যাপারটা ভাবামাত্রই সে মাথা নাড়ল। তাতে কোনও লাভ নেই। অবস্থা একই থাকবে। বড় ক্লাবে গেলে বছরে তিন-চারটের বেশি ম্যাচে চান্স পাবে না। ছোট ক্লাবগুলোতে হরিমাধবদা নেই যে লড়াই হবে। কালকের ম্যাচটায় যদি চান্স পাওয়া যেত !

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল জামাকাপড় ছেড়ে। খুব টায়ার্ড লাগছে। খিদেও পাচ্ছে। কিন্তু এ বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কয়েকটা সময় বাঁধা আছে। সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে চা অথবা কমপ্লান, সঙ্গে বিস্কুট। সাতটার সময় সেটা পাওয়া যাবে না। নটা থেকে বারোটার মধ্যে ভাত। বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে মুড়ি চিড়ে শসা এবং চা। রাত নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে রুটিতরকারি এবং একটি আমিষ। খেতে হলে এই সময়ের মধ্যে বাড়িতে থাকতে হবে নইলে লবডঙ্কা। পিতৃদেবের আদেশ অমান্য করার সাধ্য কেলোর মায়ের নেই।

'কাল মোহনবাগান মাঠে তোদের খেলা ?' দেবাশিষ অন্ধকার ঘরে ঢুকল।

www.MurchOna.com

'কে বলল ?' বুকের ভেতর থম্ ধরল স্বপ্নাশিষের।

'বাবা। বললেন তোমার ভাই কিরকম খেলে দেখে আসতে পারবে ?'

'কী বললি ?'

'আমার হাসপাতাল আছে, যাব কী করে ?' দেবাশিষ হাসল, 'পরশুর কাগজে যেন তোর ছবি দেখি। এ-সব ম্যাচে সেঞ্চুরি করলে কাগজে ছবি ওঠে।'

'আমি কাল খেলছি না।'

'সেকি ? কেন ?'

'সবাইকে সব ম্যাচে খেলতে হবে তার কোনও মানে আছে ?' খিঁচিয়ে উঠল স্বপ্নাশিষ। তার কথা বলতে একটুও ভাল লাগছিল না। দেবাশিষ বুঝল ভাই-এর মেজাজ কোনও কারণে খুব খারাপ। সে সস্নেহে বলল, 'বাবার ওপর রাগ করিস না। ওঁর কথা বলার ধরণ ওইরকম কিন্তু তোকে খুব ভালবাসেন। নইলে কোন মাঠে তোর খেলা সেই খবর রাখতে যাবেন কেন ? বুঝলি।'

স্বপ্নাশিষ সাড়া দিল না।

ভোরবেলায় অভ্যেসে ঘুম ভেঙেছিল। পুরনো জুতো পরেই বেরিয়ে পড়েছিল স্বপ্নাশিষ। মাঠে পৌঁছে খেয়াল হল। সবাই যখন জানবে খেপ খেলার জন্যে সে আজ চান্স পাচ্ছে না তখন জোর হাসাহাসি হবে। কিন্তু মাঠে না যাওয়াটাও তো খুব খারাপ দেখাবে। মাঠের ছবিটা প্রতিটি ভোরের থেকে আলাদা নয়। সে লক্ষ করল, সুব্রত পাক দিচ্ছে। বল করার বদলে দৌড়াচ্ছে ও। ম্যাচের দিন ভারী প্র্যাকটিস করা পছন্দ করেন না হরিমাধবদা। স্বপন ব্যাট করছে। দুতিনটে বল কিন্তু করল স্বপ্নাশিষ। সুব্রত তখনও দৌড়ে চলেছে। অর্থাৎ হরিমাধবদা ওকে জানিয়ে দিয়েছেন আজ দলে নেই। অত দৌড়ালে কেউ সারাদিন মাঠে থাকতে পারবে না।

সাতটা নাগাদ সবাইকে কাছে ডেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ক্লাবে চলে আসতে বললেন হরিমাধবদা। মালিকে কয়েকটা জরুরি আদেশ দিয়ে যেন বাধ্য হয়েই তিনি স্বপ্নাশিষকে দেখতে পেলেন, 'তোমার বন্ধু স্বীকার করেছে। দশটা পাক দিতে বলেছি। আজকের জন্যে ওই যথেষ্ট।'

স্বপ্নাশিষ কোনও কথা বলল না।

'তুমি এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন ?'

'এমনি।'

'টিম থেকে বাদ পড়ে কিরকম লাগছে ?'

'খারাপ। খুব খারাপ।'

'কথাটা মন থেকে বলছ কি ?'

'হ্যাঁ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। টিমে না থাকলেও ম্যাচ দেখতে আসবে। কে কী ভুল করছে নোট করবে। ক্রিকেটের সঙ্গে ইনভলভড না হলে ক্রিকেট কিছু দেবে না তোমাকে। আর হ্যাঁ, জুতোটা পরে আসোনি কেন ?'

'এমনি।'

এই সময় সুব্রত এল হাঁপাতে হাঁপাতে। এসে বলল, 'সরি স্বপ্ন। আমার জন্যে তুই শাস্তি পেলি। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

হঠাৎ হরিমাধবদার গলার স্বর বদলে গেল, 'তোরা কী করলি বল তো ! ভেবেছিলাম আজ খুব ফাইট দেব। বড় টিমকে সহজে জিততে দেব না। তোদের দুজনের ওপর খুব ভরসা করেছিলাম আমি আর তোরাই—।' চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালেন হরিমাধবদা, 'কী করা যাবে !'

সুব্রত বলল, 'আমার তো শাস্তি পাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

হরিমাধবদা কোনও উত্তর না দিয়ে হাঁটছিলেন। সুব্রত ওঁর পেছন পেছন ছুটছিল। দৃশ্যটা দেখতে একটুও ভাল লাগছিল না স্বপ্নাশিষের। শাস্তি হয়ে গেছে বলে সুব্রত যদি আজ সুযোগ পায় তাহলে তাকেও হরিমাধবদা বলতে পারতেন দশ কিংবা পনেরো পাক দৌড়াতে। মরিয়া হয়ে দৌড়াত সে। তারপরেই খেয়াল হল, হরিমাধবদা কখনও আপোস করেন না। সুব্রতকে কখনওই খেলাবেন না তিনি।

চুপচাপ মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। পিতৃদেব যদি জিজ্ঞাসা করেন তা হলে স্পষ্ট মিথ্যেকথা বলতে হবে, শরীর ভাল নেই বলে আজ খেলছে না সে। সত্যি কথা বললে আর বাড়িতে থাকা যাবে না।

পাড়াতে ঢুকতেই স্বপ্নাশিষ দেখল রকে কেলো বসে আছে। তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'কেমন আছ ?'

'আছি। তুমি ?'

'চলে যাচ্ছে। ট্যাক্সি চালাই, একটু আধটু ইনকাম হচ্ছে।' কেলো হাসল 'তোমার মতো কপাল করে জন্মাইনি তো ! যাক, মা কীসব বলছিল !'

খোঁচাটা হজম করল স্বপ্নাশিষ, 'আজকে আমার মেজাজ ভাল নেই, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

কেলো মাথা নাড়ল, 'মা তোমাকে কী বলেছে ?'

স্বপ্নাশিষ ছেলেটার দিকে তাকাল। ক্ষয়াটে চেহারা, পোড়খাওয়া মুখ। ঘাড়ের অনেক নীচে চুল। গায়ের রঙ ঘন কালো। কিন্তু জামা প্যান্টে কায়দা আছে।

স্বপ্নাশিষ বলল, 'তুমি কী কারও সঙ্গে প্রেমট্রেম করছ ?'

'আমি কি বাচ্চা না বুড়ো যে প্রেম করব না ?'

'কিন্তু কার সঙ্গে করছ, তাকে তোমার মায়ের পছন্দ হয় না। ওঁকে আমি জ্ঞান হবার পর থেকে চিনি। তোমার মা কষ্ট পাবে এমন কাজ করছ কেন ?'

'যাঃ শালা। প্রেমটা আমি করছি মা তো করছে না। মায়ের কী প্রব্লেম ?'

'ওকে তো তুমি বিয়ে করবে।'

'কে বলেছে ?'

'মেয়েটা তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না ?'

'চাইলেই করব তেমন মাল আমি নই। বাইরের গরুর কাছে যখন দুধ মিলছে তখন কোন বুদ্ধু বাড়িতে গরু পোষে ? আর প্রেম আমি একজনের সঙ্গে করছি না, অন্তত ছয়জন লাইনে আছে বস্। এ সব নিয়ে মাকে চিন্তা করতে নিষেধ করো।' কেলো দাঁত বের করে হাসল, 'তুমি তো ক্রিকেট খেলো। তোমার খেলার মাঠ কি একটাই, নাকি যে মাঠে ম্যাচ পড়বে সেখানে গিয়ে খেলো, বলো।'

স্বপ্নাশিষ আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তার মনে হল কেলোর মায়ের অন্তত ওই মেয়েটাকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। তার ছেলে ইতিমধ্যে গভীর জল চিনে ফেলেছে বেচারা শুধু এই খবরটুকু জানে না। হঠাৎ পেছন থেকে তার নাম ধরে কেউ চিৎকার করে ডাকছে শুনতে পেয়ে মুখ ফেরাল স্বপ্নাশিষ। সুব্রত দৌড়ে আসছে। কাছে এসে হাঁপাতে লাগল সুব্রত। ওর মুখ লাল, চোখ বড়, ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। ওই অবস্থাতেই কথা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু স্বপ্নাশিষ বাধা দিল, 'দাঁড়া, আগে ঠিক হয়ে নে। কী হয়েছে তোর ? দৌড়ে এলি কেন ?'

ততক্ষণে বুকে বাতাস নিয়েছে সুব্রত। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'তোকে রেডি হয়ে মাঠে চলে যেতে বলেছে হরিমাধবদা, তুই আজ খেলবি।'

হঠাৎ যেন পৃথিবীটা কি রকম হয়ে গেল, দুহাতে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্নাশিষ চেঁচিয়ে উঠল, 'সত্যি বলছিস ?' সুব্রত মাথা নাড়ল। ওর ঘেমে যাওয়া শরীরের কাঁপুনি তখন স্বপ্নাশিষের দুই হাতের মধ্যে।

'কী করে হল ?'

'হয়ে গেল। দোষ তো আমার, তোর নয়।'

'তুই ?'

'না। আমাকে দুটো ম্যাচ বসতে হবে।'

সুব্রতর দিকে তাকাল স্বপ্নাশিষ। নিজের সুযোগ পাওয়া নিয়ে বিন্দুমাত্র না ভেবে তার খবর দিতে এ-ভাবে ছুটে এসেছে ও। হয়তো সে যাতে সুযোগ পায় তার জন্যে এতক্ষণ ধরে হরিমাধবদাকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে। অথচ তখন সে ভেবেছিল নিজের জন্যে সুব্রত হরিমাধবদার পেছনে ছুটছিল।

'একই অন্যায়ের দুরকম ফল হবে কেন ?' স্বপ্নাশিষ আপত্তি করল।

'বাজে কথা বলিস না। তোকে প্রচণ্ড ভালবাসে হরিমাধবদা। যা, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। আমি মাঠে থাকব। জলদি যা।' সুব্রত ফিরে গেল।

টিম হারল। কিন্তু বিরাশি রানে স্বপ্নাশিষ আউট হবার আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল বড় দলের কপালে দুর্ভাগ্য আছে। প্রথম তিনটে ওভার একটু ঝামেলা হয়েছিল। বল বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। সেইসঙ্গে টেনসন ছিল খুব। তিন ওভারের সময় বোলারের মাথার ওপর দিকে তাকিয়ে মাঠের বাইরে যেন ব্যালকনি দেখতে পেল সে। অথচ ময়দানের খেলায় গাছগুলোকে ব্যালকনি ভাবার কোনও কারণ নেই। সঙ্গে সঙ্গে জড়তা কেটে গেল। ব্যালকনি গাছ হয়ে গেল বটে কিন্তু ব্যাট থেকে রান আসতে লাগল। ইতিমধ্যে ছটা উইকেট পড়ে গেছে, কিন্তু বাকি পঞ্চাশ রান করতে কোনও অসুবিধে হবে না বুঝতে পারছিল স্বপ্নাশিষ। ওভারের আগে নতুন ব্যাটসম্যানকে সে বলেছিল শেষ বলে সিঙ্গল নেবে, তা চুরি করে হলেও। বেশি বল খেলতে চায় এখন থেকে। দুটো দুই-এর পর শেষ বল এল। লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল, ঘোরাতে চেয়েছিল স্বপ্নাশিষ, ঠিক ব্যাটে বলে হল না। উইকেট কিপারের পাশ দিয়ে যে বলের যাওয়ার কথা সেটা যে কী করে মিড অনে যায় তা বুঝতে পারার আগে দেখল পার্টনার ছুটে আসছে রান নিতে। অতএব স্বপ্নাশিষকেও ছুটতে হল। ক্রিজে পৌঁছাবার আগেই ছোড়া বল উইকেট উড়িয়ে দিল।

স্বপ্নাশিষ দেখল বিপক্ষ উল্লাসে লাফাচ্ছে। যে বলে রান নেই সেই বলে পার্টনার কেন রান নিল ভাবতেই মনে হল দোষ তার। সে-ই ওকে নির্দেশ দিয়েছিল চুরি করেও রান নিতে। মাথা নিচু করে যখন বেরিয়ে আসছে তখন প্রচুর হাততালি কিন্তু সেটাই অসহ্য মনে হচ্ছিল।

বেঞ্চিতে গিয়ে বসে চোখ বন্ধ করল স্বপ্নাশিষ। প্যাড খুলতেও ইচ্ছে করছিল না। অনেকেই কাছে এসে 'ওয়েল ডান' বলে গেল। কিন্তু সে জানে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গিয়েছে। একসময় হরিমাধবদা সামনে এলেন, 'দোষটা কার ?'

মুখ থেকে হাত সরাল না সে, 'আমার।'

'তোকে কতবার বলেছি যে বলে রান নেই সেই বলে রান নিতে চাওয়া মানে, সুইসাইড করা।'

স্বপ্নাশিষ চোখ খুলল না, জবাবও দিল না।

হরিমাধবদা ধমকালেন, 'চোখ খোল। প্রব্লেম ফেস্ করতে শেখ। চোখ বন্ধ করলেই সবকিছু এড়িয়ে যেতে পারবি ?'

চোখ খুলল স্বপ্নাশিষ, 'কিন্তু আমার জন্যে তো টিম—।'

'নেক্সট টাইম, নেক্সট টাইম দেখা যাবে। আজই কলকাতার ক্রিকেট শেষ হয়ে যাচ্ছে না। শুধু আজকের অভিজ্ঞতাটা মনে রাখিস।' হরিমাধবদা কথাগুলো বলতেই পাশ থেকে একজন বলল, 'স্বপ্ন তো অসীমের কল-এ রেসপন্স করেছে। ওর কী দোষ ?'

হরিমাধবদা দাঁড়িয়ে গেলেন, 'এক্ষেত্রে ওর উচিত ছিল দাঁড়িয়ে থেকে অসীমকে আউট করে দেওয়া। নতুন ব্যাটসম্যানের চেয়ে সেট হয়ে যাওয়া ব্যাটসম্যানের ক্রিজে থাকা টিমের পক্ষে অনেক জরুরি।' হরিমাধবদা দাঁড়ালেন না।

তুমি যদি জিততে চাও তা হলে তোমাকে নির্মম হতে হবে। অভিযানে বেরিয়ে দলের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অভিযান বাতিল হয় না, অসুস্থকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেই উপায় না থাকলে তাকে ফেলে রেখেই এগোতে হবে। এক্ষেত্রে দয়া মায়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলো শুধুই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কোনও কোনও মানুষ জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার সময় এমনই কঠোর হন। তাদের নিষ্ঠুর বলা হয়। ইতিহাস ওইসব মানুষের জন্যে শেষপর্যন্ত জায়গা রাখে।

ঠোঙার কাগজে ওইটুকুনি পড়তে পারল স্বপ্ন। আজকাল কলকাতায় ঠোঙার ব্যবহার হয় না বললেই চলে। কেলোর মা কোনও জিনিস আনতে হলে কী করে ঠোঙায় নিয়ে আসে সে-ই জানে। লেখাটা কার, কী বিষয়ে তা জানার উপায় নেই কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকে গেল হুড়মুড় করে। চোখের সামনে নিষ্ঠুর মানুষগুলোর মুখ ভেসে উঠল। হিটলার, মুসোলিনি, হিন্দি ফিল্মের ভিলেন যে অর্থে নিষ্ঠুর, লক্ষ্য ছাড়া আর

কিছুতেই যাদের মন ছিল না বা নেই সেই অর্থে অবশ্য চৈতন্য বা বুদ্ধদেবকে ভাবা যায় না। যদিও তাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, মায়া সরিয়ে দিয়েছিলেন মন থেকে। হঠাৎই পিতৃদেবের মুখ মনে এল। জন্মাবধি সে এমন নিষ্ঠুর মানুষ আর দেখেনি। কোথায় লাগে হিটলার! তেমন ক্ষমতা পেলে তিনি সমস্ত পৃথিবীজুড়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানাতেন, সাইবেরিয়া তো পুঁচকে জায়গা। কোনও দয়ামায়ার নাম নেই ওঁর অভিধানে। অথচ মানুষটিকে কেউ হিটলার বলবে না। পরিবারের বাইরের কাউকে আগ বাড়িয়ে আঘাত করেন না। আবার রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো আদর্শ অথবা বিবেকানন্দ কিংবা বুদ্ধদেবের মতো বিশালতা যে তাঁর আছে এমন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তিনি শুধু নিষ্ঠুর মনে এগিয়ে চলেছেন যদিও তাঁর লক্ষ্য কী সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

সেই বড় ম্যাচের পরের সকালে প্র্যাকটিস থেকে ফেরামাত্র তিনি বাঘের মতো গর্জন করলেন, 'এটা কী হচ্ছে? একে কি খেলা বলে? আর মাত্র আঠারো রান করার ধৈর্য তোমার রইল না! মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তুমি আমার ছেলে নও, হাসপাতালে পাল্টাপাল্টি হয়ে গিয়েছে। ওয়ার্থলেশ।'

পিতৃদেব তার ক্রিকেট নিয়ে এই যে মাথা ঘামাচ্ছেন এটাই স্বপ্নাশিষের কাছে এখন বিস্ময়কর যে সে কথা বলতে পারল না। কিন্তু তিনি বাঘের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছেন, 'অ্যানসার মি! বলো, তুমি ওয়ার্থলেশ কি না?'

'আপনিই তো বললেন।'

'হ্যাঁ। আমি বলেছি এবং সেটাই শেষ কথা। তোমার পরম পূজনীয় বড়দাদা বললেন ও তো কলেজের পরীক্ষায় এইট্টি টু কখনও পাবে না, ক্রিকেটে পেয়েছে। আর একটি দৃষ্টান্ত। বই-এর পোকা হয়ে থাকলেই যে পণ্ডিত হওয়া যায় না তার প্রমাণ ঈশ্বর এ বাড়িতে চালান করেছেন। যাকগে, যে ছোঁড়াটা তোমার কাছে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করতে আসে সে খেলেনি কেন?'

মিথ্যে কথা বলতে পারল না সে, 'সুযোগ পায়নি।'

'তাই নাকি? যাকগে, তোমাদের টিম যিনি করেন তিনি দেখছি কিছুটা বুদ্ধিমান লোক। তোমাকেও বাদ দিলে পুরোটা বলতাম। গেট লস্ট।'

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করবে তিনি তার সঙ্গে সবসময় ওই ভঙ্গি এবং ভাষায় কথা বলেন কেন? দাদার সঙ্গে কথা বলার সময় তাপ অবশ্যই থাকে কিন্তু ঝাঁজ থাকে না, ভাষাও এ দেয়ালে

ও দেয়ালে ঠোক্কর খায় না। ব্যঙ্গ করতে হলে তিনি বড়জোর ডাক্তারবাবু শব্দটি ব্যবহার করেন। ইচ্ছে হলেও স্বপ্নাশিষ সাহসী হয়নি। এই মুহূর্তে সে পৃথিবীর অনেকেরই মুখোমুখি হতে পারে, এনি ফাস্ট বোলার কিন্তু পিতৃদেবকে নয়।

খেয়েদেয়ে কলেজে বের হবার সময় পিতৃদেবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে আড়চোখে দেখল খবরের কাগজটা তখনও খোলা। অর্থাৎ ওই কাগজে নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে কিছু খবর বেরিয়েছে। প্র্যাকটিসে গিয়ে শুনেছিল দু'তিনটে কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছে। একটা ইংরেজি কাগজ লিখেছে স্বপ্নাশিষ আর আধঘণ্টা ক্রিজে থাকলে বড় টিমকে প্রথম হারের স্বাদ পেতে হত। ওর পার্টনারের দোষে ছেলেটাকে প্যাভেলিয়ানে ফিরতে হয়েছে। সি এ বি-র উচিত এই ছেলেটার ওপর নজর রাখা। পিতৃদেব যে কাগজ পড়েন সেটিও ইংরেজি এবং ঐতিহ্যবহনকারী। ওখানে কী লেখা হয়েছে জানতে হবে। এখন ওঁর সামনে গিয়ে কাগজ দেখতে চাওয়া মানে হ্যাংলামি সেটা বুঝে গিয়েছে সে।

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে বাসটা পৌঁছাতেই স্বপ্নাশিষ তাকে দেখতে পেল। হ্যারিসন রোডে, দাঁড়িয়ে আছে বাস বা ট্রাম ধরবে বলে। দেখামাত্র সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল। সেই অনুভূতি ঠিক হতে না হতেই বাস অনেকটা এগিয়ে গেছে। পড়ি কি মরি কিছু লোককে রাগিয়ে দিয়ে সে বাস থেকে প্রায় লাফিয়ে নামল।

বেশ কিছুটা পথ দৌড়ে ফিরে এসে বাস স্টপের দিকে তাকাতেই বুকটা কেমন হয়ে উঠল। সে নেই। সে কি ভুল দেখেছিল ? জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে।

'কী হয়েছে ?'

প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখল একজন প্রৌঢ় তাকে প্রশ্ন করছে।

'কেন ? কী হয়েছে মানে ?'

'মাথা নাড়ছ একা একা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'আপনি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ?'

'মিনিট পাঁচেক।'

'ওই স্টপে একটি মেয়ে সালোয়ার কামিজ পরে দাঁড়িয়েছিল, দেখেছেন ?'

'কী আশ্চর্য ! আমি পথেঘাটে মেয়ে দেখে বেড়াই নাকি ?'

'দুর্গাঠাকুর দেখেন না ? সরস্বতী ?' স্বপ্নাশিষ দৌড়ে হাওড়া থেকে আসা একটা বাসের উঠে পড়ল। এখানে যখন দাঁড়িয়েছিল তখন

নিশ্চয়ই শেয়ালদা স্টেশনে গিয়েছে ট্রেন ধরতে। বাসটা যদি তাড়াতাড়ি যায় তা হলে হয়তো প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই ওকে ধরতে পারবে। কিন্তু বাসে ড্রাইভারের সম্ভবত কোনও তাড়া ছিল না। আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে অহেতুক দাঁড়াল। পুরবী সিনেমার সামনে যখন গড়াচ্ছে তখন স্বপ্নাশিষ চেঁচাল, 'এটা কী হচ্ছে ? বাস না গরুর গাড়ি ?'

সিটে বসা একজন মন্তব্য করলেন, 'গরুর গাড়িই ভাল, আজকাল স্টেটবাস যা অ্যাকসিডেন্ট করছে ! তাড়া থাকলে ট্যাক্সি নিলেই হত !'

ঝগড়া করতে পারত কিন্তু একটুও ইচ্ছে হল না। ছবিঘরের সামনে বাস থামতেই সে নেমে পড়ল। ফ্লাইওভারের নীচ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষের দঙ্গল দেখতে দেখতে সে একসময় স্টেশনের সামনে চলে এল। না, মেয়েটি কোথাও নেই। নিশ্চয়ই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছে। একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে সে ভেতরে ঢুকে বোর্ডের দিকে তাকাল। নৈহাটি লোকাল ছাড়া কোন ট্রেন শ্যামনগরে যায় ?

একজন কালো কোটধারীকে প্রশ্নটা করতে সে জানতে পারল মিনিট কুড়ি পরে রানাঘাট লোকাল ছাড়বে দু নম্বর থেকে। শ্যামনগরে যাওয়ার শেষ গাড়ি গিয়েছে আধঘণ্টা আগে। খবরটা জানার পর একটু স্বস্তি হল। না, কোনওভাবেই সে ট্রেন ধরে ফিরে যায়নি আজ। দু নম্বর প্ল্যাটফর্মটা হেঁটেই দেখল স্বপ্নাশিষ। না, মেয়েটি কোথাও নেই। কিন্তু গেল কোথায় ? সে ট্রেনের নাম লেখা বোর্ডের নীচে চলে এল।

'আরে আপনি ? কোথায় যাচ্ছেন ?'

স্বপ্নাশিষ দেখল তার কাছাকাছি বয়সের একটি ছেলে প্রশ্নটা করছে হাসিমুখে ?

'কোথাও যাচ্ছি না।'

'তা হলে এখানে ? কাউকে সি অফ করতে এসেছেন বুঝি ?'

না বলতে গিয়ে সামলে নিল স্বপ্নাশিষ। তা হলে স্টেশনে আসার আর কী কৈফিয়ত থাকতে পারে ? সে মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল।

'আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। আপনার খেলা আমি দেখেছি।'

'কোথায় ?'

'শ্যামনগরে। আপনাকে হায়ার করে নিয়ে গিয়েছিল বাবলুদা। কালকেও তো আপনি দারুণ খেলেছেন।' ছেলেটি অনাবশ্যক হাসল।

এবং তখনই স্বপ্নাশিষের মনে হল অবিলম্বে এর সঙ্গ এড়ানো দরকার। শ্যামনগরের ছেলে যখন তখন মেয়েটিকে নিশ্চয়ই চেনে। ও সঙ্গে থাকলে সে এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে কী করে ? ছেলেটি বলল,

'সেদিন কিন্তু আহির বেশি কিছু আহত হয়নি। কিন্তু ওরা ওটাকেই ইস্যু বানিয়ে গোলমাল করল খেলা বন্ধ করতে। হেরে তো যেতই।'

আহির! তবে কি মেয়েটির নাম আহির। এরকম নাম তো সে কখনও শোনেনি।

'তা হলে উনি কেন প্রতিবাদ করলেন না?'

'ও প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। ওর কপালে দেওয়ালে ধাক্কা লেগে বলটা এসেছিল, এটা যে নেহাতই অ্যাকসিডেন্ট তা সবাই জানে। কিন্তু ওর মা রাজি হননি, উনিই নিষেধ করেছিলেন ওকে বাইরে বের হতে। পরে আহির আমাদের বলেছে।'

'আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে?'

'বাঃ, আমরা তো ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হচ্ছি। ও রোজ কলকাতায় পড়তে আসে। পড়াশুনায় খুব ভাল।' স্বপ্নাশিষ কথাগুলো শুনে এমন ভঙ্গি করল যেন সে ওখানেই কথা শেষ করতে চাইছে। কিন্তু ছেলেটি সেটা বুঝল না। স্বপ্নাশিষের পাশে হাঁটতে লাগল।

ঠিক তখনই আহির প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। স্বপ্নাশিষের মনে হল ঠিক সেদিনের মতোই তাজা দেখাচ্ছে ওকে। আর তারপরেই কপালে লাগানো ছোট্ট ব্যান্ড-এইড নজরে এল। সেটা খুব খারাপ লাগত যদি আহির একা থাকত। ওর পাশে একটি লম্বা ছেলে গল্প করতে করতে আসছে। ছেলেটিকে দেখতে অনেকটা অক্ষয়কুমারের মতো।

আহির মুখ তুলে বোর্ড দেখে কিছু বলল ছেলেটিকে। ছেলেটি হাসল।

স্বপ্নাশিষ ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। এই অক্ষয়কুমারও কি শ্যামনগরের ছেলে? আহিরের সঙ্গে কী সম্পর্ক ওর? এখান থেকে চুপচাপ চলে যাওয়াই বোধহয় ভাল।

'এই আহির।' পাশ থেকে চিৎকারটা ছুটে যেতে অবাক হয়ে তাকাল সে। তার সঙ্গে লেগে থাকা ছেলেটা হাত নেড়ে আহিরকে ডাকছে। আহির তাকাল। ওর চোখে বেশ খুশি ফুটে উঠল যেন। দ্রুত এগিয়ে আসছিল ও। সঙ্গের ছেলেটা কী করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়।

'কী রে বাপী, তুই এখানে?'

'এমনি বেড়াতে এলাম।'

'টিটি ধরলে বুঝতে পারবি!'

'ধ্যাত, সমীরের মাস্থলি নিয়ে এসেছি। এঁকে দ্যাখ, চিনতে পারছিস?'

আহির যেন আগে লক্ষই করেনি এমন ভঙ্গিতে দেখল। দেখে ঘাড় নেড়ে না বলল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা কিরকম নিস্তেজ হয়ে গেল স্বপ্নাশিষের।

'তোর কপালে ব্যান্ড-এইড লাগাতে হয়েছে কেন ?'

'ও। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ওভাবে বলছিস কেন ? অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। আমি যদি অসতর্ক হয়ে না দাঁড়াতাম তা হলে বলটা লাগত না।'

কথাটা শেষ করে স্বপ্নাশিষের দিকে আহির এমন ভাবে তাকাল যেন দোষটা তারই। স্বপ্নাশিষ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। বাপী জিজ্ঞাসা করল, 'তোর সঙ্গে কে এসেছে ?'

'চিনি না।' হাসল আহির।

'চিনিস না মানে ?'

'ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে আসছি সঙ্গে এসে জুটল। গায়ে পড়ে আলাপ করল।'

'তুই অ্যালাউ করলি ?'

'বাঃ, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করছে ততক্ষণ আপত্তি করব কেন ? তাছাড়া কেউ একজন সঙ্গে থাকলে আর কেউ বিরক্ত করতে আসে না। প্ল্যাটফর্মে ঢুকে বললাম, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে যা শিখেছি সব ভুলে যাব। ও বোকার মতো হাসল আর তখনই তুই ডাকলি।' ঘড়ি দেখল আহির, 'এখনও ট্রেনটা আসেনি কেন ?'

'এসে যাবে। আমার খুব খিদে পেয়েছে, খাওয়াবি ?' বাপী জিজ্ঞাসা করল।

'আমাকে দেখলেই তোর খিদে পায়, না ?' মাথা নাড়ল আহির, 'আমি এই ট্রেন মিস করব না। কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিলাম বলে আগের ট্রেনটা ধরতে পারিনি।'

'তুই মাইরি ভীষণ নিষ্ঠুর। ওপরের রেস্টুরেন্টে গেলে সিগারেট খেতে পারতাম।'

'এখানে খা।'

'দূর। কে না কে দেখবে ঠিক খবর পৌঁছে যাবে পাড়ায়।'

'উঃ। ঠিক আছে। এর পরের নৈহাটিটা ধরব কিন্তু। চল।'

সঙ্গে সঙ্গে বাপী পা বাড়াল। স্বপ্নাশিষ দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। ঘাড় ঘুরিয়ে আহির জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যাবেন না ?'

'আমি খানিক আগে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি।'

'ও। কোনও কাজ না থাকলে চা খেতে তো আসতে পারেন।'

আগ বাড়িয়ে যেতে পারছিল না স্বপ্নাশিষ, আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দিত হল। ওরা প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দোতলার সিঁড়ির মুখে পৌঁছানো মাত্র বাপী বলল, 'তোরা এগো, আমি সিগারেট নিয়ে আসছি।'

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আহির জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?'

'না তো। কেন?'

'বাঃ, লোকে শুধু শুধু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে নাকি?'

স্বপ্নাশিষ অস্বস্তিতে পড়ল। সত্যি কথা কি এ অবস্থায় বলা যায়?

'আমি ভাবলাম আবার কোনও বন্ধুর সঙ্গে খেলতে যাচ্ছেন কোথাও!'

'না। আমি ওই খেপ খেলতে আর যাব না।'

'খেপ মানে?'

'এটা একটা চালু কথা। পয়সা নিয়ে অন্য টিমে এক আধবার খেলে দেওয়াকে খেপ খেলা বলা হয়। পয়সা না পেলে আক্ষেপ।'

'সেদিন শ্যামনগরে খেপ খেলছিলেন?'

'না আক্ষেপ। টাকা পাইনি। খেলা ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল বলে ওরা টাকা দেয়নি।'

'আপনি কি শুধুই ক্রিকেট খেলেন?'

'না। কলেজে পড়ি।'

'সেদিন আপনার বন্ধু বলছিল আপনি বেঙ্গলে খেলবেন, তাই?'

চমকে তাকাল স্বপ্নাশিষ। ওরা ততক্ষণে রেস্টুরেন্টে পৌঁছে গিয়েছিল। সে অবাক হয়ে বলল, 'শ্যামনগরে যাওয়ার সময় আমরা যে একই কামরায় ছিলাম সেটা মনে আছে আপনার?'

'কেন থাকবে না! আপনারা তো সবাইকে শুনিয়ে কথা বলছিলেন।'

এখন রেস্টুরেন্ট মোটেই ফাঁকা নয়। প্রতিটি টেবিলেই অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের ভিড়। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল না ওঠার ইচ্ছে আছে। আহির বলল, 'যাঃ, বাপীর আর বসে খাওয়া হল না। একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি তো আগে কখনও আমাকে দেখেননি, নামও জানেন কি না জানি না। ট্রেনে খানিকটা সময় এক কামরায় ছিলাম, শুধু তার জন্যে আমার ওপর অতটা রেগে গিয়েছিলেন কেন?' আহির স্পষ্ট চোখে তাকাল।

'রেগে গিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ। না হলে প্রতিটি বলকে আমাদের ব্যালকনিতে পাঠাবার চেষ্টা করতেন না। শুধু ওই চেষ্টার জন্যে অন্যদিকে পাঠালে যে বলে রান পেতেন সেই বল আমার দিকে পাঠাতে চেষ্টা করে রান পাননি। আপনি অস্বীকার করতে পারেন ?'

শরীর বরফ হয়ে যাচ্ছিল স্বপ্নাশিষের। কোনওমতে বলল, 'বিশ্বাস করুন, আপনার ওপর আমার কোনও রাগ নেই। রাগ থাকার কোনও কারণ নেই।'

'আমারও তো তাই বক্তব্য।'

বাপী এল, 'কী রে, জায়গা নেই ?'

'না। হাউজ ফুল।'

বাপী তাকাল। কোণার এক টেবিলে দুটো ছেলেমেয়ে মগ্ন হয়ে কথা বলে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'কী এত গল্প করছে ওরা ?'

'তোর কী ?'

'পাশে তিনটে চেয়ার খালি রয়েছে। চল গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।'

'কী জিজ্ঞাসা করবি ?'

'আমরা বসতে পরি কিনা ! দাঁড়িয়ে তো খাওয়া যায় না তাই আপনারা যদি গভীর ষড়যন্ত্রের প্ল্যান না করেন তা হলে এই টেবিলে বসতে পারি, ব্যাস। আয় তোরা।'

স্বপ্নাশিষ দেখল বাপী জায়গা দখল করল। ছেলেটাকে প্রথম প্রথম যত বোকা বোকা লেগেছিল ও আদৌ তা নয়। আলাপ করার সময় নিশ্চয়ই একটু ভান করেছিল। বাপী হাত নেড়ে ডাকতেই ওরা এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল। বসতেই বাপী আহিরকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তুই কখনও প্রেমে পড়েছিস ?'

'তার মানে ?'

'আমি তো পড়িনি তাই পড়লে কেমন লাগে জানতে খুব ইচ্ছে হয়।' খুব সরল গলায় বলল বাপী, মুখে এক ফোঁটা কৌতুক নেই। টেবিলটা যাদের দখলে ছিল সেই ছেলেমেয়ে দুটো খুব অস্বস্তিতে পড়েছে প্রশ্নটা শুনে বুঝতে পারল স্বপ্নাশিষ। আহির বলল, 'তোর মতো একটা উল্লুকের প্রেমে কোনও মেয়ে পড়বে না এটাই তো স্বাভাবিক।'

'তুই আমাকে উল্লুক বললি ?' রেগে গেল বাপী।

'ঠিক বলেছি। তুই কখনও উল্লুক দেখেছিস ?'

জবাব দিতে গিয়ে ভাবতে লাগল বাপী, তারপর স্বপ্নাশিষকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনি উল্লুক দেখেছেন ? কি রকম দেখতে ? ভাল্লুকের মত ?'

আহির হাসল শব্দ করে, 'আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়া, দেখতে পাবি।'

'এটা জমা থাকল, বদলা একসময় নেব। কিন্তু পাবলিক অর্ডার নিতে আসছে না কেন ? কী খাবি তুই ? এখন সব পাওয়া যাবে।'

'টোস্ট আর চা।'

'আমি শুধু চা।' স্বপ্নাশিষ বলল।

বাপী চলে গেল কাউন্টারে অর্ডার দিতে। আহির বলল, 'ও একটু বেশি কথা বলে কিন্তু মন খুব ভাল। আপনাদের আগে থেকেই পরিচয় ছিল ?'

'না। আজই আলাপ হল। ও-ই এসে আলাপ করল।'

'কী বলল ?'

'ওই সেদিন খেলার কথা, আপনাকে আমি মেরেছিলাম—।'

'আপনি আমাকে মারেননি।'

'একটু আগে আপনি বললেন আপনাকে লক্ষ্য করে বল হিট করেছি।'

'আপনি দেখছি খুব ঝগড়ুটে।'

বাপী ফিরে এল। যতক্ষণ ওরা রেস্টুরেন্টে ছিল ততক্ষণ বাপীই কথা বলে গিয়েছে। আহির তাকে থামাবার চেষ্টা করেও পারেনি। খাবার এসেছে, শেষ হয়েছে, তারপরে বিল। পকেটে হাত দিয়েছিল স্বপ্নাশিষ এবং তখনই মনে পড়েছিল মাত্র দশ টাকা রয়েছে। ওই টাকায় হয়তো এখনকার বিল মেটানো যাবে কিন্তু তারপর ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাপী বাধা দিল, 'না দাদা, আপনি নয়। আপনাকে অন্য একদিন বধ করব। আজ আহির দাম দেবে, তাই কথা হয়ে আছে।'

স্বস্তি পেল স্বপ্নাশিষ। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে নীচে নামতেই আহির বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা, ট্রেন ছেড়ে দেবে।' ওরা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। ওদের সঙ্গে খানিকটা হেঁটে থেমে গেল স্বপ্নাশিষ। সে কেন যাচ্ছে ? তার তো যাওয়ার কথা নয়। তাকে থামতে দেখে আহির দাঁড়াল, 'আমি বিদ্যাসাগর মর্নিং-এ পড়ি। ইচ্ছে হলে ওখানে আসতে পারেন।' বলেই ছুট লাগাল।

ট্রেনটাকে ওদের তুলে নিয়ে চলে যেতে দেখল স্বপ্নাশিষ। গার্ডের কামরা মিলিয়ে গেলেই মনে হল পুরো স্টেশন ফাঁকা। এতক্ষণ যে জীবনটা টগবগিয়ে উঠেছিল তা চলে যাচ্ছে শ্যামনগরে। চারপাশের মানুষজন, মাইকের আওয়াজ সব যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল তার কাছে। অথচ তার ভাল লাগছিল। আহির। আহির মানে কী ? শব্দটা খুব চেনা

চেনা অথচ অর্থটা তার জানা নেই। কিন্তু তার মনে হল আজ এখন থেকে তার জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল। খানিকটা প্ল্যাটফর্ম দৌড়ের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে সে হাত চালাল। ছিমছাম একটা স্কোয়ার কাট।

৩

বিকেলে বেশ কিছুটা সময় ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ করার পর হরিমাধবদা বললেন, 'কাল থেকে তোদের কয়েকজনকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব। ম্যাচ না থাকলে চারজন করে সপ্তাহে দুদিন যাবি। মোহনবাগান লেনের অশোক গাঙ্গুলির বাড়িতে একটা ভাল জিমন্যাসিয়াম করেছে। ও আমাকে কথা দিয়েছে তোদের দু ঘণ্টা করে ব্যবহার করতে দেবে। ঠিক আছে ?'

একটা ভাল জিমের অভাব এদিকে অনেকদিনের। হরিমাধবদা প্রায়ই সেকথা বলেন। বিদেশে, এমন কি বোম্বাইতেও প্লেয়াররা নিয়মিত জিমে যায়। খবরটা শুনে ওদের প্রত্যেকেই খুশি হল। আজকাল ক্রিকেট আর দুধু-ভাতু খেলা নয়। একজন ব্যাটসম্যান কত রান করল সেটাও যেমন লক্ষ করা হয় কত রান বাঁচাল সেটাও হিসেবে আনা হয়। তাই একজন ভাল ফিল্ডারের শরীর ফুটবলার বা হকি প্লেয়ারের মত গতিশীল হতেই হবে। শরীরের কোনও অংশেই জড়তা থাকলে চলবে না। পঙ্কজ রায়, ভিনু মানকড় ব্যাটে যত রান পেয়েছেন তার সিকি রান বিপক্ষকে দিয়েছেন ফিল্ডিং-এ দুর্বলতার জন্যে। পঞ্চাশ রান করা ব্যাটসম্যানের হাত গলে দুবার বল বেরিয়ে গেলে টিম থেকে বাদ হয়ে যাওয়া আজ খুব স্বাভাবিক ঘটনা যা তিরিশ বছর আগে ভাবা যেত না। প্র্যাকটিস শেষ করে সুব্রতর পাশে বসেছিল স্বপ্নাশিষ। আজ খুব খিদে পাচ্ছে। এখনও ছুটে বাড়িতে গেলে বিকেলের জলখাবার পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

সে সুব্রতকে বলল, 'অ্যাই, তোর কাছে টাকা আছে ?'

'কেন ?'

'খিদে পেয়েছে, খেতাম।'

'কী খাবি ?'

'রোল। ফড়েপুকুরের মোড়ে সেই দোকানটায় চল।'

পেছন থেকে হরিমাধবদার গলা পাওয়া গেল, 'না না। ওসব খেতে যাস না। খিদে পেয়েছে যখন তখন আমার ওখানে চল। আয়।'

ওরা একটু অবাক হল। সাধারণত কাউকে বাড়িতে ডাকেন না হরিমাধবদা।

ভাই-এর সঙ্গে থাকেন জানা ছিল কিন্তু হরিমাধবদার দুটো ঘর একদম আলাদা। ওদের বসতে বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। ঘরের তিনটে আলমারি জুড়ে বই আর বই এবং সবগুলোই ক্রিকেট নিয়ে। বাংলা এবং ইংরেজি বইগুলোতে ক্রিকেট জীবন ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে। ওপাশে একটা রেকর্ড প্লেয়ার। স্বপ্নাশিষ এগিয়ে গেল। টেপ রেকর্ডার এসে রেকর্ড প্লেয়ারের জায়গা দখল করে নিয়েছে। আজকাল আর কাউকে রেকর্ড বাজাতে দেখা যায় না। কৌতূহলী হয়ে রেকর্ড-এর স্টক দেখছিল সে। সুব্রত পেছন থেকে বলল, 'হাত দিস না, দেখলে রেগে যাবে। আমাদের বাড়িতেও ওসব আছে। হেমন্ত সন্ধ্যা মানবেন্দ্র, বাবা এখনও শোনে। তোদের বাড়িতে নেই ?'

'বাবা সঙ্গীত ভালবাসেন এমন প্রমাণ এখনও পাইনি।'

'তোর বাবা ফুল বা শিশুকে ভালবাসেন ?'

'সেরকম কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'তা হলে তো ভদ্রলোক মানুষ খুন করতে পারেন।' বলেই খুক খুক করে কাশল সুব্রত।

কথাটা শুনতে ভাল না লাগলেও প্রতিবাদ করল না স্বপ্নাশিষ কারণ ওই বিখ্যাত লাইনটা তার জানা। রেকর্ড দেখতে দেখতে সে আবিষ্কার করল ওগুলোর সবকটাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের। হয় খেয়াল নয় সেতার কিংবা সরোদের। এই ব্যাপারটা সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না।'

এইসময় হরিমাধবদা ঘরে এলেন, 'রেকর্ড দেখছ ? ক্লাসিক্যালে ইন্টারেস্ট আছে ?'

'ওরে ব্বাবা।' সুব্রত বলল, 'ওসব বুঝতেই পারি না।'

'বুঝতে চেষ্টা করো না বলো। ধরো খুব ভোরে কেউ ভাঁয়রো বাজাচ্ছে সানাই-এ, প্রকৃতির দিকে তাকালে তোমার মনে আনন্দ আসবেই। দেখবে কানে যা শুনছ আর চোখে যা দেখছ তা কী করে একাকার হয়ে যাচ্ছে। দিনরাতের বিভিন্ন সময় অনুযায়ী এক এক রকমের রাগ রাগিনী। তা ছাড়া ঋতু অনুযায়ী রাগ, মনের অনুভূতি অনুযায়ী রাগ, এ-সব বিশ্বাস সমুদ্রের মতো। একবার ইন্টারেস্ট পেলে সাঁতার না কেটে উপায় নেই। এই রেকর্ডটা শোনো—।' হরিমাধবদা একটা রেকর্ড চালু করলেন। বাজনা শুরু হল।

'তোমাদের কোনও অস্বস্তি হচ্ছে ?'

স্বপ্নাশিষ অবাক হল, 'কি রকম ?'

'এটা এখন বাজার কথা নয়। এখন কেউ আহিরভাঁয়রো বাজাবে না। ভোরের সুর সন্ধ্যায় বাজলে অস্বস্তি হবেই।'

চমকে তাকাল স্বপ্নাশিষ, 'কী বাজবে না বললেন ?'

'আহিরভাঁয়রো।'

'আহির, মানে কী ?' কি রকম রিমঝিম সুর বাজতে লাগল স্বপ্নাশিষের রক্তে।

'আমার যতদূর মনে হয় আরম্ভ বা প্রথম এইরকম কিছু হবে নান্দীমুখ।

স্বপ্নাশিষের মনে সেই ঝকমকে মুখটি চলকে উঠল। এখন এই মুহূর্তে সে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাড়ির সামনের মাঠ দেখছে ? এখন কি শ্যামনগরে সন্ধে নেমে গেছে ? আজ সে এমন কোনও ব্যবহার করেনি যাতে মনে হয় স্বপ্নাশিষ সম্পর্কে আলাদা কোনও ভাবনা ভাবতে পারে ! তাই কি ? যে ছেলেটা ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল তাকে নিশ্চয়ই কলেজে দেখা করতে বলেনি ! কাজের লোক এইসময় চিকেন চাউমেন নিয়ে এলে সাগ্রহে হাত বাড়াল স্বপ্নাশিষ।

বাড়িতে ফিরে স্বপ্নাশিষ দেখল বাইরের দরজা বন্ধ। এরকম সচরাচর হয় না। পিতৃদেব এইসময়ে বাইরের ঘরের ইজিচেয়ার দখল করে শ্যেন চোখে জগৎ দেখেন। আজ হঠাৎ কোথায় গেলেন তিনি বুঝতে না পেরে কড়া নাড়ল সে। এ বাড়িতে কলিং বেল নেই। কেন নেই সেই প্রশ্ন কেউ কখনও তোলেনি।

খানিকবাদে কেলোর মা দরজা খুলে বলল, 'কানের মাথা খাবে নাকি ? অত জোরে বাজাচ্ছ ?'

'বাবা কোথায় ?'

'তোমার মাসি এসেছিল তাকে পাতাল রেলে পৌঁছাতে গিয়েছেন।'

'মাসি ? আমার আবার মাসি আছে নাকি ?'

'আমি তো এ বাড়িতে ঢোকার পর দেখিনি।'

'তুমি না দেখলে আমি দেখব কী করে ? কোথায় থাকে ?'

'তা জানি না। এঘরে বসে বাবুর সঙ্গে কত কথা ! এমনিতে গলা থেকে হাঁড়ির আওয়াজ বের হয় আর আজ কত সুর বাজল। বাবুর গলা বলে চেনাই যাচ্ছিল না। চা বিস্কুট দিতে হল। যাওয়ার সময় বাবা বলে গেলেন, 'কেলোর মা, ছেলেদের মাসি এদিকের পথঘাট ঠিক চেনে না, পাতালরেলে নামিয়ে দিয়ে আসি।' কেলোর মা কথা শেষ করে দুমদাম পা ফেলে ভেতরে চলে গেল। ব্যাপারটা যে সে পছন্দ করেনি তা পরিষ্কার।

কোনও মহিলা আত্মীয়া জ্ঞান হবার পর এ বাড়িতে পা দেয়নি। তা

হলে এই মাসি কোত্থেকে এলেন ? তিনি নিশ্চয়ই এমন কেউ যাকে দেখে পিতৃদেবের চরিত্র বদলে গেল ! তিনি নিজে না বললে উত্তরটা জানা যাবে না যখন তখন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।

ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল খবরের কাগজটা টেবিলে রয়ে গেছে। আজ তালে গোলে ভুলে গিয়েছিল ওটার কথা। কাগজটাকে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল স্বপ্নাশিষ। পেছনের পাতা জুড়ে খেলার খবর। তন্নতন্ন করে খুঁজে সে কোনও খবরই দেখতে পেল না। শুধু এক জায়গায় কলকাতার ক্রিকেট বলে গতকাল কারা জিতেছে কারা হেরেছে তাদের নাম দেওয়া আছে। খেলা সম্পর্কে বা কোনও খেলোয়াড় সম্পর্কে একটাও লাইন নেই।

কাগজের অন্য পাতাগুলো দেখল স্বপ্নাশিষ। আশ্চর্য ! তাহলে পিতৃদেব আজ সকালে অত ডিটেলস বললেন কী করে ? বাড়িতে এটা ছাড়া অন্য কাগজ আসে না যে তিনি তাতে পড়বেন অথবা বাড়ির বাইরেও পা দেননি ? কাল কেউ নিশ্চয়ই তাঁকে বলে যায়নি খেলার বিবরণ ? সে কেলোর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা কি কাল সারাদিন বাড়িতে ছিল ?'

'না। সকালে খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছিল, বিকেলে ফিরেছে।'

'কোথায় গিয়েছিল কিছু বলেছে ?'

'না তো। হয়তো ওই মাসির বাড়িতে গিয়েছিল। পঞ্চাশ বছরের মেয়েছেলে রঙিন শাড়ি পড়ে মুখে রঙ মেখে বিবিটি সেজে এসেছে, ছিঃ।'

'বাজে বকো না তো। জিজ্ঞাসা করছি এক, বলছ আর এক।'

'কী জিজ্ঞাসা করছ ?'

'কিছু না যাও।' স্বপ্নাশিষ ভাবতে পারছিল না। হতেই পারে না। পিতৃদেব তার খেলা দেখতে মাঠে যেতে পারেন না। জীবনে যাননি। তা হলে অতসব জানলেন কী করে ?

শরীর ক্লান্ত ছিল। বালিশে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়তে বসবে বলে ভেবেছিল সে, দেবাশিষের ঠেলায় ঘুম ভাঙল। দেবাশিষ বলল, 'চল, খেতে দিয়েছে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল স্বপ্নাশিষ, 'বাবা ?'

উত্তরটা পাওয়ার আগে বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ শোনা গেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই সময়টাই সবচেয়ে খারাপ। তিনজনকে একসঙ্গে খেতে বসতে হয়। খাওয়ার সময় জিভে শব্দ করা সম্পূর্ণ নিষেধ। প্রতিটি গ্রাস ভাল করে চিবিয়ে খেতে হবে। পছন্দ হচ্ছে না বলে কোনও

খাবার না খাওয়া চলবে না। বইপত্র নিয়ে খাবার টেবিলে বসা আইনবিরুদ্ধ। প্রয়োজন হলে পিতৃদেব কথা বলবেন সবাইকে শুনতে হবে। খাওয়া শেষ হলেই চেয়ার ছেড়ে চলে আসা ঘোরতর অন্যায়। তাই গোগ্রাসে গিলেও ওই সময়টা শেষ হবার জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। স্বপ্নাশিষ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

পিতৃদেব ইতিমধ্যেই তাঁর জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন। দুই ভাই দুদিকে বসামাত্র আজ কেলোর মা খাবার পরিবেশন করতে লাগল। এত রাত পর্যন্ত তার থাকার কথা নয়। অন্যদিন দাদা খাবার পরিবেশন করে ভক্তিভরে। আজ কেলোর মায়ের কী হল ?

খাবার মুখে দিয়ে পিতৃদেব বললেন, 'বড্ড একঘেয়ে রান্না। এই জন্যে লোকে মাঝেমাঝে রাঁধুনি চেঞ্জ করে। কেলোর মাকে দিয়ে আর চলে না।'

কেলোর মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ বড় হয়ে গেল। এবং তারপরই তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হঠাৎ আমার রান্না খারাপ হয়ে গেল কেন ? এতদিন বলেননি আজ বলছেন, এ আমি মানব না ? এই বাহানা দেখিয়ে আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরব। মা মরার আগে বলেছিল, কেলোর মা, এ বাড়ি ছেড়ে যাস না কোথাও। কত লোক বেশি মাইনে দিয়ে টানতে চেয়েছিল, আমি এ বাড়ির কাজ ছেড়েছি ?'

'কাজ ছাড়ার কথা কেউ বলেনি। যেমন আছ থাকবে, আমি না হয় আর একটা রান্নার লোক রেখে দেব। এতে তো কোনও অসুবিধে নেই ?'

'আমার কোন রান্নাটা খারাপ হয়েছে, অ্যাঁ ? ছেলেরা বলুক, তারাও তো খাচ্ছে, কী গো, আমার রান্না খারাপ লাগছে ?' দু'পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল কেলোর মা।

দেবাশিষের মাথা প্রায় টেবিলের কাছে নেমে গেল, স্বপ্নাশিষ চোখ বন্ধ করল। পিতৃদেবের মতের বিরুদ্ধে কিছু বললে বিপদে পড়তে হবে এটা জানা কথা।

বাঁ হাতটা অবহেলায় নাড়লেন পিতৃদেব, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমাকে ছাড়াচ্ছি না। যা পারো রেঁধে যাও। আর শোনো, কথায় কথায় এদের মরা মায়ের কথা তুলো না। তিনি তোমার কানে কানে এত কথা বলে গিয়েছেন যে আমি হিসেব রাখতে পারছি না।'

কেলোর মা চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়া চলল। হঠাৎ

পিতৃদেব বললেন, 'আজ তোমাদের মাসিমা এসেছিলেন। দিল্লিতে থাকতেন ওঁরা। তোমার মায়ের মাসতুতো বোন। আমার বিয়ের সময় তাকে একটিবার দেখেছিলাম। স্বামী বড় চাকুরে ছিলেন। তিনি গত হওয়ায় কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তোমাদের মামার বাড়ির সঙ্গে তো আমাদের যোগাযোগ নেই, তবু ইনি এলেন।'

দেবাশিষের সম্ভবত মুখ ফসকেই বেরিয়ে এল, 'মাসিমা ? আমাদের ?'

সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেবের মুখ হিটলারের মতো হয়ে গেল, 'আমি কি কেলোর মাসির কথা বলছি ? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ডাক্তারি করবে কী করে ?'

সঙ্গে সঙ্গে দেবাশিষ গুটিয়ে গেল, 'আই অ্যাম সরি।'

পিতৃদেব আজ সহজেই সহজ হয়ে গেলেন। এটা ব্যতিক্রম ঘটনা।

'তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। সন্তান হয়নি তাই অন্তর সাহারা হয়ে আছে।'

স্বপ্নাশিষ চুপচাপ শুনছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আবার আসবেন ?'

'দক্ষিণে থাকে তো ! তবে এখন পাতাল রেল হয়ে গিয়েছে, সময় কম লাগবে। তবে এবার আমাদের উচিত রিটার্ন ভিজিট দেওয়া। তোমরা দুই ভাই গিয়ে প্রণাম করে এসো একদিন।'

এরপর আর কথাবার্তা নেই।

খাওয়া শেষ হলে দেবাশিষ ভাই-এর ঘরে এল, 'কেলোর মা সত্যি বাজে রাঁধে।'

'তা হোক। এই বয়সে কাজ চলে গেলে বেচারা কী করবে ?'

'বাবা তো বললেন কাজ ছাড়াবেন না।'

'ওর অনেক সমস্যা। ওর ছেলে প্রেম করে বেড়াচ্ছে।'

'তুই জানলি কী করে ?'

'কেলোর মা আমাকে মেয়েটার চিঠি দেখিয়েছে।'

'সর্বনাশ। তুই ওসব দেখিস না স্বপ্ন। বাবা শুনলে খুব রাগ করবেন। ওরা নিচু ক্লাশের লোক, প্রেমট্রেম যা করার ওরা করুক।'

'তার মানে ? প্রেম কি নিচু ক্লাশের লোক করে ? রোমিও জুলিয়েট, লায়লা মজনু, রাধাকৃষ্ণ, সুভাষচন্দ্র এমিলি শেঙ্কল কি নিচু ক্লাশের মানুষ ?'

'ওঃ, তুই ভীষণ আরগুমেন্ট করিস। বিবেকানন্দের জীবনীটা ভাল করে পড়িস ? ব্রহ্মচর্যই হচ্ছে শেষ কথা। মেয়েদের সবসময় মাতৃরূপে চিন্তা করবি।'

'মা তো বাবার স্ত্রী, প্রেমিকা।'

'ইডিয়ট। আমি সেই মায়ের কথা বলছি না। জগজ্জননীরূপ জানিস ? তোরা একটা মেয়ের কথা মনে এলেই তার শরীরের কথা ভাবিস। কিন্তু কোনও মেয়ের শরীর ওপেন করলে দেখতে পেতিস রক্তমাংস চর্বি আর হাড় ছাড়া কিছু নেই। আর সেগুলোর অবস্থান ছেলেদের চেয়ে অনেক জটিল। না না, তোর কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না। বাবার কথা মনে রাখ। মা চলে যাওয়ার সময় তুই এইটুকু ছিলি। নিজের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে তোকে মানুষ করেছেন ব্রহ্মচারীর মতো। যে কোনও সন্তানের কাছে পিতাই স্বর্গ পিতাই ধর্ম। তিনি চান আমরা ব্রহ্মচারীর মতো বাস করি, তাই করব। সত্যিকারের সুখী জীবন, শান্তির জীবন যদি চাস তা হলে বন্ধনমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।'

'আশ্চর্য ! তুই আমাকে এত জ্ঞান দিচ্ছিস কেন ?'

'তোর মধ্যে দুর্বলতা ঢুকছে। আমি পড়েছি ক্রিকেটারদের চারপাশে মেয়েরা ঘুরঘুর করে। একদম পাত্তা দিবি না। কেলোরা প্রেম করুক, উচ্ছন্নে যাক।' দেবাশিষ কথা শেষ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পরের ম্যাচে আবার সেঞ্চুরি। একশ বত্রিশ নট আউট, একটা চান্সলেস ইনিংস। ওপেন করতে এসে সাত উইকেট পর্যন্ত আশি বলে ওই রান। দল জিতল তেইশ রানে। হরিমাধবদা জড়িয়ে ধরেছিলেন। সেঞ্চুরির জন্যে নয়, থার্ড স্লিপে ফিল্ড করে তিনটে চমৎকার ক্যাচ ধরার জন্যে তিনি এতটাই উৎফুল্ল যে সাগরে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিলেন স্বপ্নাশিষকে। খেতে খেতে বললেন, 'জানিস স্বপ্ন, আমার জীবনেও একটা স্বপ্ন আছে। অনেক অপমান, কষ্ট, দুঃখ মুছে ফেলার স্বপ্ন। এই এত বছর ধরে আমি চেষ্টা করে চলেছি, পূর্ণ হয়নি। হ্যাঁ, আমি অনেক রঞ্জি প্লেয়ার তৈরি করে দিয়েছি কিন্তু তারা সুযোগ পাওয়া মাত্র আমাকে ছেড়ে গিয়েছে।'

হরিমাধবদার মুখ দেখে কষ্ট হল স্বপ্নাশিষের, 'কী স্বপ্ন আপনার ?'

'একই সঙ্গে লিগ এবং নকআউট জিতব। যে দুটো টিম কলকাতায় রাজত্ব করে, তাদের ওপরে আমাদের ক্লাবকে তুলে দেব। এই দুটো ক্লাব ছাড়া আর একটা ক্লাব রাজত্ব করত আমাদের সময়ে। ওদের ক্লিকবাজিতে আমাকে দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল। যাকগে, আজ জেতার পর আমরা এখন দু নম্বরে। বাকি দুটো ম্যাচ যদি জিততে পারি তখন একটা সুযোগ আসবে। লিগ পেতেই হবে আমাদের। আজ যে ম্যাচ তুই খেললি ঠিক সেই খেলা খেলতে হবে।'

'সুব্রতকে আজ খেলালেন না কেন ?'

'দুটো ম্যাচের জন্যে ওকে সাসপেন্ড করেছিলাম। ও কখনও সিরিয়াস নয়, বেশিদিন টিকতে পারবে না। সুব্রতর বদলে হিমাদ্রী কি খারাপ খেলেছে ? খেলেনি। তবে পরের ম্যাচে ওকে নামাব। স্বপ্ন, টাকার জন্যে খেপ খেলিস না।'

'আমি কথা দিয়েছি আপনাকে।'

সেই সন্ধেবেলায় ঘটনাটা ঘটল। পিতৃদেবের ডাক আসতে তাঁর বসার ঘরে গিয়ে দেখল দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ঘরে ঢোকামাত্র একজন বললেন, 'এসো এসো ? আমরা তোমার সঙ্গে ফাইনাল করতে এলাম ভাই।'

'কী ব্যাপারে ?' মিনমিন করল স্বপ্নাশিষ।

নিজেদের টিমের নাম করল একজন। এই টিম এখন এক নম্বরে। বললেন, 'সামনের সিজনে তুমি আমাদের টিমে খেলবে। দশ হাজার টাকা পাবে আর চাকরির ব্যবস্থা হবে। তোমার ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি।'

পিতৃদেব বললেন, 'সেকি ? এই খেলা খেলে এত পাওয়া যায় ?'

'আমরা দিচ্ছি ! কিন্তু তার বদলে আমাদের অনুরোধ আছে।'

'অনুরোধ ?' পিতৃদেব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। ওদের আর দুটো ম্যাচ বাকি। ও যেন দুটো ম্যাচে কুড়ির বেশি রান না করে, ব্যাস। ও না দাঁড়ালে দল ভেঙে পড়বে। হরিমাধবকে আর চ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন দেখতে হবে না। এটুকু করলেই চলবে।'

'আমি ইচ্ছে করে আউট হব ?' হাঁ হয়ে গেল স্বপ্নাশিষ।

'ওই আর কী ! তোমার পারফরমেন্স খারাপ হলে আমাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকাবে না। ওহো, বুঝতে পারোনি, তুমি ভাবছ স্কোর না করতে পারলে বেঙ্গল টিমে তোমার কথা ভাবা হবে না। নো, নট অ্যাট অল। আজ সন্ধেয় ঠিক হয়ে গেছে কাদের ডাকা হবে ? লিস্টে তুমিও আছ। অবশ্য লিস্টে থাকলেই ফাইনাল সিলেকশনে যে থাকবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু আমরা কথা দিচ্ছি তোমাকে এবছর রঞ্জি খেলাবই। কি, বলো, রাজি আছ ? তা হলে অ্যাডভান্স দিয়ে যাই।'

'আমি একটু ভেবে দেখি।'

'এ নিয়ে ভাবার কী আছে ?'

স্বপ্নাশিষ অন্যদিকে তাকাল। তার মন কিছুতেই প্রস্তাব মেনে নিতে পারছিল না।

এবার পিতৃদেব বললেন, 'অল্প বয়স। আপনারা বললেন আর ও হ্যাঁ বলে দেবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। ভাবুক, ওকে ভাবতে দিন।'

'ওকে! আপনার বাড়িতে ফোন আছে?'

'না।'

'ও। তা হলে আমরাই যোগাযোগ করব। নমস্কার।'

লোকদুটো চলে গেলে সে ভেতরে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু পিতৃদেব তাকে ডাকলেন, 'ওরা দশহাজার টাকা এবং চাকরি দিতে চাইছিল। তোমার কি মনে হয় এর চেয়ে বেশি পাওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে?'

স্বপ্নাশিষ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হল? আমি বোধহয় তোমার কাছে কিছু জানতে চাইছি!'

'আমি জানি না।'

'ওরা তোমাকে বেঙ্গল টিমে খেলানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, শুনেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে রাজি হলে না কেন?'

'আমাকে হরিমাধবদার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'কেন?'

'তিনি আমার কোচ। তাঁর কাছে আমি খেলা শিখেছি।'

'মনে হল এঁরা তোমার কোচের শত্রু।'

'তা হলে এঁরা আমার বন্ধু নয়।'

'বাঃ, এই কারণে তুমি টাকা এবং সুযোগ হারাবে, তা ভেবেছ?'

'আমি তো এখনও ছাত্র, টাকার কী দরকার! আর যদি ভাল খেলি তা হলে একদিন না একদিন সুযোগ পাব। আমার থেকে দশ বছরের বড় হয়েও উৎপলদা এবার প্রথম ইন্ডিয়া খেলেছে। আমার তো অনেক সময় আছে।'

'এ সব ভাবছ কেন? হোয়াই?'

'আপনি বলতেন, প্রতিটি সন্তানের উচিত পিতা যেখানে থাকতে বাধ্য হয়েছেন সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া। দাদার কাছে শুনেছি যিনি শিক্ষা দেন তিনিও এক ধরনের পিতা। তা হলে হরিমাধবদার স্বপ্ন সার্থক করা আমার কর্তব্য।'

পিতৃদেব কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'জুতোটা তোমার পায়ে ঠিক হয়েছে? তোমাকে তো পরতে দেখি না। রোজ না পরলে অভ্যস্ত হবে কী করে? আর হ্যাঁ, হরিমাধবকে বলবে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। যাও।'

পরের ম্যাচেও সেঞ্চুরি। টিম জিতল। খবরের কাগজগুলো উচ্ছ্বসিত। তারা লিখল বেঙ্গল টিমে নতুন রক্ত চাই। আর এইজন্যে স্বপ্নাশিষের সুযোগ পাওয়া দরকার। স্বপ্নাশিষ প্রমাণ করেছে নিজেকে। শেষ ম্যাচে জিতলে শ্যামবাজারের দল কলকাতার লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে। এবং এটা সম্ভব হচ্ছে স্বপ্নাশিষের জন্য। স্বপ্নাশিষ নিশ্চয়ই আগামী বছর শ্যামবাজারে খেলবে না কিন্তু বেঙ্গল টিম অরুণ লালের পর একটি নির্ভরযোগ্য প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান পেল।

রঞ্জি ট্রফির জোনাল ম্যাচে যাদের নেটে ডাকা হয়েছে, তাদের মধ্যে স্বপ্নাশিষও রয়েছে। ময়দানে এখন ক্রিকেট নিয়ে বেশ উত্তেজনা রয়েছে। শেষ ম্যাচে শ্যামবাজার স্পোর্টিং-কে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হবার শেষ ধাপে মুখোমুখি হবে এক নম্বরের। এরকম ঘটনা অনেকদিন পর ঘটতে যাচ্ছে। খেলার দিন সকালে কাউকে প্র্যাকটিস করালেন না হরিমাধবদা। শুধু বললেন, 'যে বল মারার নয় তা মারতে যাবি না। অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলকে খোঁচা দেওয়া মানে আমার মাথায় আঘাত করা, এটা মনে রাখবি। একটা বলও যেন ফিল্ডিং-এর সময় হাত গলে বেরিয়ে না যায় এইভাবে লড়বি।'

বাড়ি ফিরতেই পিতৃদেবের সামনে ওঁদের দেখতে পেল স্বপ্নাশিষ।

একজন বললেন, 'তুমি বেঙ্গল টিমে খেলছই, ভেতরের খবর দিলাম।'

দ্বিতীয়জন হাসলেন, 'আজ তা হলে অ্যাডভান্স নাও।'

পিতৃদেব বললেন, 'আপনাদের তো বলেছি হরিমাধবের সঙ্গে কথা না বলে ও কিছুই করবে না। আর এই সময় হরিমাধবকে ও বলতে পারছে না কিছু।'

'আশ্চর্য! আপনি ওর গার্জেন, হরিমাধব নয়। আমরা ওকে যেভাবে ব্যাক করতে পারব হরিমাধব কখনও তা পারবে? নেভার! তা ছাড়া আজ ও না খেললেই ভাল হয়।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'না ভজুদা, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে। বরং সেকেন্ড ওভারেই এল বি হয়ে গেলে ভাল হয়।'

'বেশ তাই হোক। তোমাদের টিম আজ না জিতলে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব। তোমার বন্ধুদের দুজন আমাদের সাহায্য করবে। বুঝতেই পারছ আমরা কোনও ঝুঁকিতে যেতে চাইছি না। তুমি আমাদের দলে খেললে দেখবে ইন্ডিয়া খেলার চান্স পেলেও পেতে পারো। শ্যামবাজারে থাকলে ডুবে যাবে।'

স্বপ্নাশিষ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। মাঠের বাইরে এই খেলার কথা সে

এতকাল শুনে এসেছে আজ সরাসরি দেখতে পেল। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আমাকে আমার মতো খেলতে দিন।'

'তার মানে ?' প্রথমজন চমকে উঠল।

পিতৃদেব বললেন, 'ও বলতে চাইছে সামনের বছর আপনারা ওর সঙ্গে কথা বলবেন। আমি বুঝতে পারছি না আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? ও ভাল খেললেও আজ ওর টিম হারতে পারে। যদি না হারে শেষ ম্যাচে আপনারা ওদের হারাবেন কারণ আপনারা বড় টিম। যাও, ভেতরে যাও। তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই।'

মাঠে ভিড় হয়েছিল। বড় দলের অনেকেই খেলা দেখতে এসেছে। নামার আগে সুব্রত বলল, 'স্বপ্ন, তোর কাছে কেউ গড়াপেটা করার প্রস্তাব দিয়েছে ?'

সুব্রত আজ খেলছে। স্বপ্নাশিষ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'রাজি হয়েছিস ?'

'মাথা খারাপ। তুই জানলি কী করে ?'

'আমার কাছেও গিয়েছিল। টিমের কেউ কেউ টোপ গিললেও গিলতে পারে। আমরা আজ অলআউট যাব। হরিমাধবদার প্রেস্টিজ মানে আমাদেরও প্রেস্টিজ।'

প্রথমে ব্যাট করতে নামল প্রতিপক্ষ টসে জিতে। স্লিপ ছেড়ে গালিতে গিয়ে দাঁড়াল স্বপ্নাশিষ। যে বলই তার কাছে যাচ্ছে তাকেই তালুবন্দি করে ফেলছে সে। সুব্রত আজ দারুণ বল করছিল। কিন্তু দলের এক মিডিয়াম ফাস্ট বোলারের বল খুব প্যাঁদাচ্ছিল ওরা। ছেলেটা আজ কেন লেংথে বল রাখতে পারছে না আর লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল করছে এটা ভেবে পাচ্ছিল না ওরা। সুব্রত গিয়ে কয়েকবার উপদেশ দিয়ে এল। ক্যাপ্টেন নির্লিপ্ত।

দুশো রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নামল স্বপ্নাশিষরা। প্রথম বল, গুড লেংথ, অফ্-এর দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। উইকেটের বাইরে পা রেখে প্যাড করতে চাইল স্বপ্নাশিষ। সঙ্গে সঙ্গে আবেদন উঠল। আর সে অবাক হয়ে দেখল আম্পায়ার হাত তুলে দিয়েছেন। অসম্ভব। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। বল উইকেটে ছিল না। কোনও ভাবেই এল বি ডব্লু হবার কথা নয়। প্রতিবাদ করা অর্থহীন, মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল সে। মনে হচ্ছিল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল।

মাঠের বাইরে আসামাত্র বড় ক্লাবের সেই প্রথমজন হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওয়েল ডান। খুব খুশি হয়েছি আমরা।'

স্বপ্নাশিষ কোনও কথা না বলে নিজের জায়গায় পৌঁছে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়তেই হরিমাধবদা কাছে এলেন, 'তুই আউট হোসনি। আম্পায়ার যদি ভুল করে তা হলে তোর কিছু করার নেই। তবে তোকে কতবার বলেছি, ক্রিকেট হচ্ছে ব্যাট দিয়ে বল মারার খেলা। একমাত্র লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছাড়া প্যাড করার চেষ্টা করবি না। যাক গে।'

সেদিন খেলাটা খেলল সুব্রত। বোলার হিসেবে তিনটে উইকেট নিয়েছিল কিন্তু ছয় নম্বরে ব্যাট করে একাই টিমকে জিতিয়ে দিয়ে শ্যামবাজারকে শেষ ধাপে তুলে দিল সে। সবাই যখন তাকে জড়িয়ে ধরে উল্লাস করছে তখন সুব্রত বলল, 'দূর, আমি তো মরিয়া হয়ে ব্যাট চালিয়েছি। ঠিকঠাক লেগে গিয়ে রানগুলো চলে এল, আমার কোনও ক্রেডিট নেই।'

স্বপ্নাশিষের খুব লজ্জা করছিল। একদম অবিবেচকের খেলা খেলেছে। দশটা ভাল খেলার পর এরকম একটা খেলা খেলোয়াড়ের বারোটা বাজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

বড় টিম আজ গটআপ করার চেষ্টা করেছিল এই খবরটা চাপা থাকেনি। হরিমাধবদা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে ভজুরা কি যোগাযোগ করেছিল ?'

সত্যি কথা বলল স্বপ্নাশিষ, 'হ্যাঁ।'

'কোনও অফার দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। বেঙ্গলে খেলার সুযোগ করে দেবে বলেছে।'

'বাঃ। খুব ভাল। তা খবরটা আমাকে জানাসনি কেন ?'

'আমি গুরুত্ব দিইনি তাই আপনাকে বলিনি।'

'গুরুত্ব দিসনি ? ওরা তোকে সামনের বছর নিতে চায়নি ?'

'হ্যাঁ। দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছে কিন্তু আমি রাজি হইনি।'

'তুই যে সত্যি কথা বলছিস তার কোনও প্রমাণ আছে ? আজ যদি দলের কেউ সন্দেহ করে তুই গটআপ করে আউট হয়েছিস, একজন ইচ্ছে করে মারার বল দিয়ে রান বাড়িয়েছে তা হলে সেটা মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবি ?'

'অন্য কেউ কী করেছে আমি জানি না তবে ওরা বাড়িতে এসেছিল, আমার বাবার সামনে কথা হয়েছে। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবেন।'

'তোর বাবা তো শুনেছি ক্রিকেটের এগেইনস্টে, তা হলে কথাবার্তা বললেন কী করে ?'

'বাবা কিছুই বলেননি, কিন্তু শুনেছেন।'

'তোর উচিত ছিল আমাকে এসে জানানো। সেটাই ঠিক কাজ হত। তোর অনেস্টি নিয়ে কেউ সন্দেহ করত না।' হরিমাধবদা মাথা নাড়লেন।

'আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'না। সেটা করতে রুচিতে বাধে। কিন্তু আমরা কেউ জানলাম না—।'

'সুব্রত জানে। ওর সঙ্গে আজ ম্যাচের আগে আমার কথা হয়েছে। আমরা কিছুতেই গটআপের শিকার হব না বলে স্থির করেছিলাম।'

'তাই?'

'আপনি সুব্রতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'দরকার নেই। তুই এত কাঁচা মিথ্যে বলবি না। তা কী ঠিক করলি?'

'কিসের?'

'সামনের বছর ওদের টিমে জয়েন করবি?'

'আমি ওদের বলেছি আপনার সঙ্গে কথা বলার পর ভেবে বলব।'

হরিমাধবদা চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর কোনও কথা না বলে ফিরে গেলেন। মন খুব খারাপ হয়ে গেল স্বপ্নাশিষের। আউট না হয়েও আউট হবার চেয়ে এই মন খারাপ বেশি খারাপ।

সকাল সাড়ে নটায় বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে পৌঁছে স্বপ্নাশিষ দেখল কয়েকটা ছেলে উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে। ছেলেগুলো যে লপেটা ধরনের তা এক নজরেই বোঝা যায়। আহির কলেজ থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই হ্যারিসন রোড পর্যন্ত হেঁটে যায় এবং ওখান থেকেই স্টেশনে যাওয়ার ট্রাম বাস ধরে। তা হলে কলেজের সামনে না দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে দাঁড়ানোই ভাল।

বীণা সিনেমা ছাড়াতেই ঠনঠনের কালীবাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল সে। কিছু কিছু মেয়ে গলিটা থেকে বেরিয়ে এপাশ ওপাশ চলে যাচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে আহির নেই। তার মন বলল দশ মাইল দূরে দশহাজার লোকের মধ্যে থাকলেও সে আহিরকে এক পলকেই চিনতে পারবে।

ঘড়িতে যখন দশটা তখন চিন্তায় পড়ল সে। আহির কি আজ কলেজে আসেনি? ওর শরীর কি খারাপ? মাথার আঘাত থেকে কোনও গোলমাল হল না তো? সে মুখ ফিরিয়ে কালীবাড়ির দিকে তাকাল।

তারপর মাথা নাড়ল।

এবং তখনই সে আহিরকে দেখতে পেল। গলি দিয়ে বেরিয়ে একাই দ্রুত হেঁটে আসছে। একটা হলুদ স্বপ্নের মতো এই হেঁটে আসা। ধীরে ধীরে আবিষ্ট স্বপ্নাশিষ রাস্তা পেরিয়ে দাঁড়াল মুখোমুখি হবার জন্যে।'

'আরে! একেই বলে কাকতালীয় ব্যাপার।' সুন্দর হাসল আহির।

'কেন?'

'আজ সকালে মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হয়। এখন কলেজ থেকে বেরিয়ে ভাবলাম আপনার হয়তো আমাকে মনেই নেই।'

'আমি দেখা করতেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'

'এখানে কেন? কলেজে গেলেন না কেন?'

'ওখানে—, অস্বস্তি হচ্ছিল।'

'চলুন।'

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। রাস্তার লোকজন তাদের দেখছে। দেখুক। পৃথিবী তার সবকটা চোখ মেলে দেখে নিক। নিজেকে এখন সম্রাট বলে মনে হচ্ছে।

'খেলা কেমন চলছে?'

'ভাল না।'

'কেন?'

'কাল একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচে রান করতে পারিনি কিন্তু টিম জিতেছে।'

'এরকম তো হয়ই।'

'আমি খুব সমস্যায় পড়েছি।'

'কী?'

স্বপ্নাশিষ দাঁড়াল, 'আমরা কি কোথাও বসতে পারি? আপনার হাতে সময় আছে?'

ঘড়ি দেখল আহির। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আধঘণ্টা পরে গেলেও চলবে।'

বসার জায়গার খোঁজে হ্যারিসন রোডের মোড়ে পৌঁছে কফিহাউসের কথা খেয়াল হল। দোতলায় উঠে দেখল এখন কফিহাউস প্রায় ফাঁকা।

টেবিলে বসে আহির বলল, 'এবার বলুন।'

স্বপ্নাশিষ বলল। হরিমাধবদার সঙ্গে তার সম্পর্ক, শ্যামবাজারের ক্লাবে খেলা এবং হঠাৎই নতুন প্রস্তাবগুলোর কথা বলে গেল।

সব শুনে আহির জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এটাকে সমস্যা বলছেন

কেন ?'

'সমস্যা না ? আমি খেলতে না পারলে সবাই সন্দেহ করছে গট আপ করেছি বলে। বড় টিমে যাওয়ার কথা যদি না দিই তা হলে বেঙ্গলে চান্স পাব কিনা সন্দেহ।'

'আপনি কোনটা বড় বলে মনে করেন ? সততা না ক্যারিয়ার ?'

'দুটোই।'

'তা হলে আপনার কোচের সঙ্গে থেকে ভাল খেলার চেষ্টা করুন। আপনার মধ্যে যদি ক্ষমতা থাকে তা হলে আজ না হলে কাল সুযোগ পাবেনই।'

স্বপ্নাশিষ তাকাল। পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, চাকরি বাকরি কোনওদিন পাবে না। বড় ক্লাবে গেলে চাকরি পাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু—। সে মনে মনে স্থির করল আহিরের কথাই মেনে নেবে।

'ঠিক বলেছেন।'

কফি এল। ওরা চুপচাপ কফি খাচ্ছিল।

আহির বলল, 'চুপ করে আছেন যে, কথা বলুন।'

'হাঁ, মানে, আপনিও তো বলছেন না।'

'বুঝলাম। সমস্যা বলা হয়ে গেলে আপনারও কথা ফুরিয়ে গেল।'

'তা নয়। আসলে আমি কখনও কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলিনি।'

'মহিলা ? এমা, আপনি আমাকে মহিলা বলছেন ?'

'তা হলে কী বলব ?'

'মেয়ে। মহিলা শুনলে বয়স্কা মনে হয়। আপনার বাড়ি কোথায় ?'

স্বপ্নাশিষ বলল।

'বাড়িতে কে কে আছে ?'

স্বপ্নাশিষ জানাল।

'মা ?'

'আমাকে জন্ম দিয়ে মারা গেছেন।'

'ও। তা হলে আপনাদের বাড়িতে কোনও মহিলা নেই ?'

'না। এক কেলোর মা আছে, কাজকর্ম করে।'

'আপনার দাদা কী করেন ?'

'ডাক্তারি পড়ছে। ও বাবার আদর্শে মানুষ। সারাজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবে।'

'আশ্চর্য! আপনার বাবা তো ব্রহ্মচারী নন। উনি তো বিয়ে

করেছিলেন।'

স্বপ্নাশিষ জবাব দিল না। বাবাকে নিয়ে এ সব কথা ভাবতেও কেমন ভয় হয়।

'আপনার বাবা কি রকম মানুষ?'

'বাব্বা! প্রচণ্ড রাগী, পান থেকে চুন খসার যো নেই।'

'আপনি ভয় পান?'

'ভয় পায় না এমন কাউকে আমি চিনি না।'

'আপনার খেলাধুলাকে সাপোর্ট করেন?'

'এতদিন করতেন না, বাধাও দিতেন না। এখন যেন মনে হচ্ছে মেনে নিয়েছেন।'

'তা হলে আর আপনার সমস্যা কোথায়?'

কদিন ধরে মনের ওপর যে চাপটা জন্মে ছিল মুহূর্তেই সেটা উধাও হয়ে গেল। স্বপ্নাশিষ হাসল, 'ঠিক আছে। ছেড়ে দিন এ-সব কথা।'

'খেলাটা কবে?'

'আগামীকাল।'

'কোথায়?'

মাঠের নাম বলল স্বপ্নাশীষ। আহির বলল, 'কাল আমাদের ক্লাশ নেই। বাপীকে নিয়ে আপনার খেলা দেখতে যেতে পারি। সেঞ্চুরি করা চাই কিন্তু।'

'ইচ্ছে করলেই কেউ কি সেঞ্চুরি করতে পারে। তবে কাল একদম ধরে খেলতে হবে। আপনি মাঠে থাকলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

'কেন?'

হকচকিয়ে গেল স্বপ্নাশিষ। ছোট্ট প্রশ্নটার উত্তর দেবার মতো কোনও শব্দ তার জানা নেই। শুধু মনের ভেতরটা বলছে ভাল লাগবে তাই মুখে বলেছে। কিন্তু সেটা তো উত্তর হতে পারে না। আহির তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। উত্তরটা শোনার জন্যে উৎসুক।

'আমি জানি না।' মাথা নাড়ল স্বপ্নাশিষ। তারপরেই খেয়াল হতে বলল, 'বাড়ি ফিরতে আপনার কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'আমি তো বলেই আসব।'

'আপনার বাড়ির লোক বোধহয় আমাকে ভিলেন ভাবেন, তাই না?'

'কেন? ও, মাথায় বল লেগেছে বলে? না। ওখানে ক্রিকেট ফুটবল হয় বলে প্রায়ই আমাদের জানলার কাচ ভাঙত। সেগুলো পাল্টে এখন কাঠের করে নেওয়া হয়েছে। আমার মাথাটাকে তো পাল্টানো যাবে না। আমি ব্যালকনিতে না দাঁড়ালে অ্যাকসিডেন্টটা হত না। দোষটা

তো আমার। আপনাকে কেউ দোষী করেনি। এবার উঠতে হবে।'

দাম মিটিয়ে ওরা শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে নামল। বই-এর দোকানগুলো সবে খুলতে আরম্ভ করেছে। আহির হঠাৎ একটা দোকানে ঢুকে পড়তে স্বপ্নাশিষ সঙ্গী হল। জীবনানন্দ দাসের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কিনল আহির। দোকানদার যখন ক্যাশমেমো করছে তখন বই-এর পাতা উল্টে সূচিপত্রে নরম আঙুল রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'পড়েছেন ?'

মাথা নাড়ল স্বপ্নাশিষ, না।

দু চোখ বড় হয়ে গেল আহিরের, 'সেকী ?'

স্বপ্নাশিষ বুঝল, উত্তরটা ঠিক হয়নি। কিন্তু যা সত্যি তাই বলেছে। সে রেগে গেল, 'আচ্ছা, আপনি 'সানি ডে-জ' পড়েছেন ? পড়েননি ? বিটুইন দ্য উইকেট পড়েছেন ? তাও পড়েননি ?'

'ওগুলো নিশ্চয়ই ক্রিকেট সংক্রান্ত বই ?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন ওয়াটার পোলোর ওপর লেখা কোনও বই পড়েছি কিনা ? আরে ওগুলো হচ্ছে একটা বিশেষ শাখার বই। স্পেশ্যালাইজ্‌ড। ওই লাইনে যার ইন্টারেস্ট আছে তার জন্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের যে কোনও বাঙালির নিজস্ব অস্তিত্বের জন্যে পড়া উচিত। আমার কাছে বেশি টাকা নেই নইলে আপনাকে একটা কিনে দিতাম। এগুলো না পড়লে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়।'

পড়েনি বলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। সে কী করে বলবে বাড়িতে গল্পের বই পড়ার রেওয়াজ নেই। মায়ের আমলে যে কটি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের বই কেনা হয়েছিল তা পিতৃদেব আলমারিবন্দি করে রেখেছেন। মায়ের স্মৃতিতে হাত দেওয়ার সাহস কারও নেই। ক্লাশ সিক্সে পড়ার সময় সে কালো ভ্রমর বাড়িতে এনেছিল বলে কুড়িবার ওঠবোস করতে বাধ্য হয়েছিল।

স্টেশনে পৌঁছে আহির খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নিয়ে চলে গেল ট্রেন ধরতে। এই এতটা রাস্তা আসার সময় তাদের কথা হয়েছে খুব কম। জীবনানন্দ দাশকে শত্রু বলে মনে হচ্ছিল স্বপ্নাশিষের। তিনি কী লিখেছেন সে জানে না, কিন্তু লেখার কি দরকার ছিল ? একটা সেঞ্চুরি করার আনন্দ ম্লান হয়ে যাবে তাঁর লেখা না পড়লে ?

আজ ঘেরা মাঠে খেলা। খবরের কাগজগুলোর কল্যাণে যে উত্তেজনা শুধু দুটো দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ছড়িয়েছে সাধারণ

মানুষের মধ্যেও। প্রায় হাজার আটেক লোক হয়েছে মাঠে। টস জিতে বড় টিম ব্যাট নিল।

মাঠে নামার আগে হরিমাধবদা প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেছেন কারও বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছে আছে কি না। এই প্রশ্নের জবাবে কেউ হ্যাঁ বলবে না তিনি জানেন কিন্তু প্রশ্নটা শোনার পর ছেলেরা যেন একটু বেশি চনমনে হয়ে উঠল। শ্যামবাজারের বোলিং-এর বিরুদ্ধে বড় ক্লাবের কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে উইকেট পড়লেও ওরা পঁয়তাল্লিশ ওভারে দুশো পঁয়ষট্টি তুলে যখন প্যাভেলিয়ানে ফিরল তখন বিজয় উল্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। এই রানের পাহাড়ের কাছে শ্যামবাজারের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

ব্যাট করার আগে হরিমাধবদা স্বপ্নাশিষের সামনে এলেন, 'প্রতিটা বল মানে একটা রান। একটা বল মিস হওয়া মানে পরের বলে দুটো রান নিতে হবে। কিন্তু প্রথম পাঁচটা ওভারে টেনশন করবি না। ঝুঁকি না নিয়ে খেলবি। চোখ সেট হবার পর ওই ফর্মুলায় যাবি।'

মাথা নেড়ে মাঠে নেমেছিল স্বপ্নাশিষ। ফিল্ডিং করার সময় সে অনেকবার মাঠের বাইরে গ্যালারির দিকে তাকিয়েছে। কয়েকজন মহিলা আজ মাঠে এসেছেন খেলা দেখতে, আহির তাদের মধ্যে নেই। শব্দটা মনে আসতেই হেসে ফেলল সে হাঁটতে হাঁটতে। আহির তো নিজেকে মহিলা বলে ভাবতে রাজি নয়। হয়তো সঙ্গী পায়নি কিংবা বাড়িতে অসুবিধে হয়েছে বলেই সে আসেনি।

প্রথম ওভারে কোনও রান হল না। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে মাপা লেংথে বল করে গেল অভিষেক। বেঙ্গলের মিডিয়াম স্পেস বোলার। গতবার ইন্ডিয়া টিমের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা ঘুরে এসেছে, খেলার সুযোগ পায়নি। দুটো বল স্ট্যাম্পের মধ্যে ছিল, ডিফেনসিভ খেলেছে স্বপ্নাশিষ। মেডেনের হাততালি পড়ল। দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে কাট করতে গিয়ে কট আউট হয়ে গেল স্বপ্নাশিষের পার্টনার। কোনও রান না করে এক উইকেট। দ্বিতীয় ওভারের শেষেও স্কোর বোর্ড শূন্য।

বারোটা বল চলে গিয়েছে এখনও রান নেই। যদিও হরিমাধবদা বলেছেন ধীরে খেলতে তবু—। স্বপ্নাশিষ দেখল অভিষেক রাউন্ড দ্য উইকেট বল করতে এসেছে। পিচে পড়ে বল এতটা বাইরে দিয়ে গেল যে উইকেট কিপারকে ঝাঁপাতে হল সেটাকে ধরতে। আম্পায়ার ওয়াইড দিতে শ্যামবাজারের প্রথম রান হল। দ্বিতীয় বল ফুলটস, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাল স্বপ্নাশিষ। বিদ্যুৎবেগে চার। এই মারের পরই ছন্দ পেয়ে গেল

সে। অভিষেকের ওই ওভারে পনেরো রান নিয়ে অ্যাভারেজ পাঁচ তুলল সে। বিপরীতদিকে গিয়ে ফিল্ডারদের দেখে নেওয়ার সময় গ্যালারিতে নজর যেতেই সমস্ত শরীরের বিদ্যুৎ খেলে গেল। আহির। আহির আজ শাড়ি পরেনি। জিনসের ওপর লাল টপ। সমস্ত মাঠ যেন আলোয় ভরে গেল।

ক্রিকেটের বলকে যখন কোনও ব্যাটসম্যান ফুটবলের আকারে দেখে তখন তাকে আটকানো মুশকিল হয়। দশ ওভারে যখন নব্বুই এবং স্বপ্নাশিষের ব্যক্তিগত স্কোর বিরাশি তখন স্পিনার বল করতে এল। ভাগ্যলক্ষী যখন সাহসীদের পাশে এসে দাঁড়ান তখন বিপক্ষের কিছুই করার থাকে না। উইকেট ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে চারটে বলে ছয় মারল স্বপ্নাশিষ। পঞ্চম বলটা ব্যাটে না লাগায় ঘুরে দেখল সেটা উইকেট কিপারের হাতে চলে গেছে। ক্রিজ ছেড়ে সে এতটা এগিয়ে আছে যে ফিরে যাওয়ার সময় নেই। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল উইকেট কিপার বল ধরেই পা পিছলে পড়ে গেল। মুহূর্তেই ড্রাইভ দিয়ে লাইনের ওপাশে ব্যাট রাখতে পারল স্বপ্নাশিষ। দ্বিতীয় চেষ্টায় উইকেট কিপার বল তুলে উইকেট ভাঙার আগেই ঘটনাটা ঘটাতে পারল সে।

সেঞ্চুরি হয়ে গেছে বলে এত ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। এখন অনেক পথ বাকি। একটা চার আর দুটো করে রান প্রতি ওভারে নিলেই চলবে। পঁচিশ ওভারের মাথায় যখন স্বপ্নাশিষ আউট হল তখন দলের রান একশ নব্বই এবং তার একশো বাষট্টি। তৃতীয় রান নিতে গিয়ে রান আউট হয়ে যখন সে বেরিয়ে আসছে তখন সমস্ত মাঠজুড়ে পায়রার ডানার শব্দ। হরিমাধবদা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'শাবাশ। তোর যা করার তার চেয়ে অনেক বেশি করেছিস। একশ কুড়ি বলে পঁচাত্তর রান যদি বাকিরা না তুলতে পারে তা হলে ওদের ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবে—।'

স্বপ্নাশিষ তাকাল। ওকে ঘিরে এখন বেশ বড় ভিড়। সে-সব গ্রাহ্য না করে হরিমাধবদা বললেন, 'ক্রিকেট খেলছিস আর এটা ভুলে গেলি যে তুই দলের জন্যে খেলছিস! ওইভাবে মেরে খেললে হাততালি পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডেথ সার্টিফিকেট লেখাও হয়ে যেতে পারে। ওই সময় উইকেট কিপার যদি পড়ে না যেত তা হলে মুখ চুন করে ফিরে আসতে হত তোকে। সবসময় মনে রাখিস অতি বাড় বাড়লে ঝড়ে পড়ে যেতে হয়।'

'আপনি তো বলেন কী খেললি কেমন খেললি এ-সব কেউ মনে রাখবে না, স্কোরবুকে যা লেখা থাকবে সেটাই শেষ কথা।'

'সেই লেখাটা যাতে ভবিষ্যতে ঠিকঠাক লেখাতে পারিস তাই এইসব বলা। যাঃ, আর একজন গেল!' হরিমাধবদা ছুটে গেলেন খেলোয়াড়দের দিকে।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে এক উইকেট হাতে থাকতে ম্যাচ জিতে গেল শ্যামবাজার। বড় টিমের সমর্থকরা জানতেন তাঁরাই জিতছেন, তাই মাঠে আসার প্রয়োজন বোধ করেননি। আজকের দর্শকদের মধ্যে বেশির ভাগই যে শ্যামবাজারে-র সমর্থক তা ম্যাচের শেষে বোঝা গেল। শ্যামবাজারের কর্মকর্তারা জড়িয়ে ধরেছেন খেলোয়াড়দের। সেক্রেটারি সুনীলদা হরিমাধবদাকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন, 'ভাবতে পারিনি, অসম্ভব আপনার জন্যে সম্ভব হল।'

হরিমাধবদা স্থির। যাঁর সবচেয়ে বেশি হৈচৈ করার কথা তাঁর মুখে কোনও কথা নেই। সুব্রত সহখেলোয়াড়দের নিয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে চিৎকার করল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর হরিমাধবদা, হিপ হিপ হুররে। সুনীলদা কিছু বলতেই কয়েকজন স্বপ্নাশিষকে মাথায় তুলে নিল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর স্বপ্নাশিষ, হিপ হিপ হুররে।'

মানুষের মাথার ওপর উঠলে আকাশটা একটু নীচে নেমে আসে। তখন পৃথিবীটাকে অন্যরকম দেখায়। ওই অবস্থায় স্বপ্নাশিষ দেখল জিনস আর লাল টপ তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে ছটফটিয়ে উঠল নীচে নামবার জন্যে কিন্তু ওরা সেটাকে পাত্তা না দিয়ে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। সুনীলদা তার মধ্যে ঘোষণা করলেন, 'টিমের সবাইকে অনুরোধ করছি এখান থেকে সোজা দেশবন্ধু পার্কে চলে আসতে। এত বড় আনন্দের দিনে আমরা ওখানেই উৎসব করব।'

স্বপ্নাশিষ যখন মাটিতে পা দিল তখন একটা হাত তার দিকে এগিয়ে এসেছে। বাপী। করমর্দন করল ওরা। বাপী বলল, 'দারুণ, দারুণ খেললে গুরু।'

বাপীর পাশে যে দাঁড়িয়ে তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে স্বপ্নাশিষ জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এসেছ তোমরা ? আমি ভেবেছিলাম আসোনি।'

'একটু দেরিতে। আমরা যখন এসেছি তখন ওদের দুটো উইকেট পড়েছে।'

'সে তো অনেকক্ষণ।' এবার আহিরের দিকে তাকাল সে।

আহির হাসল। তারপর একটা প্যাকেট এগিয়ে ধরল, 'অভিনন্দন।'

'কী এটা ?'

'বাড়িতে গিয়ে দেখবেন। আপনি বলেছিলেন ইচ্ছে করলেই কেউ সেঞ্চুরি করতে পারে না। কিন্তু হল তো! সততা আর ক্যারিয়ার তা

হলে পরস্পরের শত্রু নয়।'

প্যাকেটটা হাতে নিতেই অন্যদের অভিনন্দন ঢেউ হয়ে ফিরে এল। তার মধ্যে বাপী বলল, 'আমরা যাই। অনেকদূরে ফিরতে হবে।' স্বপ্নাশিষ কথা বলতে পারল না। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল আহিরকে আর একটু থাকতে বলতে। কিন্তু এত লোক, এত উত্তাপ, সে কথা বলার সুযোগই পেল না।

সাংবাদিকরা এবার ছেঁকে ধরলেন তাকে। প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবে সে খুব সরল ভঙ্গিতে বলল, 'হরিমাধবদা ঠিক যেভাবে শিখিয়েছেন সেইভাবে খেলার চেষ্টা করেছি, তার বেশি আমি কিছু জানি না।'

'আপনি কি জানেন হরিমাধববাবু দীর্ঘদিন ধরে চ্যাম্পিয়ান হবার চেষ্টা করছিলেন একটা প্রতিশোধ নিতে। এবং সেজন্যেই আপনাদের তৈরি করেছেন!'

'আমাকে উনি খেলা শিখিয়েছেন এর বেশি কিছু জানি না।'

'আজকের সেঞ্চুরি হয়তো আপনাকে বেঙ্গল টিমে জায়গা দিয়ে দেবে। শুনেছি বড় ক্লাবগুলো আপনার সম্পর্কে আগ্রহী। ওরা অফার দিলে যাবেন?'

'সেটা হরিমাধবদাই ঠিক করবেন।'

ওরা যখন ট্যাক্সিতে চেপে দেশবন্ধু পার্কে ফিরছে তখন সুব্রত পাশে বসেছিল। হঠাৎ উরুতে চিমটি কাটল সুব্রত। হকচকিয়ে প্রশ্ন করল স্বপ্নাশিষ, 'কীরে?'

'কেসটা কী?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল সুব্রত।

'কীসের কেস?' মাথায় ঢুকল না স্বপ্নাশিষের।

'যার মাথা ফাটালি সে তোর খেলা দেখতে এসে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে ওর এর মধ্যে দেখা হয়েছিল। আমার কাছে চেপে গিয়েছিস?'

'মাঠে তো অনেকেই খেলা দেখতে এসেছিল, আমি কি সবাইকে আসতে বলেছি?'

'সবাইকে নয়, ওই একজনকে বলেছিস। বলিসনি?'

'না। ওরা নিজেরাই এসেছে।'

'দারুণ দেখতে কিন্তু।'

'তাতে তোর কী?'

'ঠিকই। বেল পাকলে কাকের কী? তবে গুরু একটু বুঝেসুঝে এগিও। শ্যামনগর খুব খতরনাক জায়গা। লাস্ট কবে দেখা হয়েছিল? ওখানে গিয়েছিলি?'

'বিশ্বাস কর, সেই খেলার পর আর আমি শ্যামনগরে যাইনি।'

'তোর কপালটা মাইরি দারুণ।'

দেশবন্ধু পার্কে মিষ্টিমুখ হৈচৈ হবার পর হরিমাধবদা দু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললেন। সবাই শান্ত হলে তিনি বক্তৃতা দেবার ঢঙে বললেন, 'আজ ক্লাবের তো বটেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ পূর্ণ হল। কজন মানুষ এ কথা বলতে পারে? আমি পারলাম ছেলেদের জন্যে। কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেকে খুব ছোট লাগছে। গত দুতিনটে ম্যাচ হবার আগে থেকে খবর পাচ্ছিলাম বড় দল লোভ দেখাচ্ছে আর আমার ছেলেদের কেউ কেউ তাতে সাড়া দেবে বলে ঠিক করেছে। অর্থাৎ যাদের নিয়ে আমি লড়াই করব তাদের কেউ কেউ আমাকে হারাতে চায়। আমি সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি, শেষপর্যন্ত ছেলেদের বলেছি। আমি আমার নিজের হাতে গড়া ছেলেদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। অথচ ওরাই আজকে আমার সাধ পূর্ণ করল। নিজেকে তাই ছোট লাগছে খুব। আমি সুনীলের কাছে অনুরোধ করব সিনিয়ারদের কোচিং থেকে আমাকে অব্যাহতি দিতে। যে সব শিশুরা প্রথম ব্যাট বল ধরতে মাঠে আসবে তাদের জন্যে কিছু করতে পারলে খুশি হব। কারণ শিশুদের এখনও জটিল জীবন যাপন করতে হয় না। একবার ভেবেছিলাম যেহেতু আমার আর কোনও ব্যক্তিগত চাওয়া নেই তাই মাঠে আসা ছেড়ে দেব। কিন্তু না। ক্রিকেট আমাকে যা দিয়েছে তার ঋণশোধ এ জীবনে হবে না। তাই শিশুদের জন্যে আমি রইলাম। নমস্কার।'

হৈচৈ পড়ে গেল। প্রতিবাদ, আব্দার, অনুনয়। জয়ের আনন্দ যেন মুহূর্তেই উধাও। কিন্তু কোনও কিছুতেই হরিমাধবদাকে সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত সুনীলদা বললেন, 'ঠিক আছে। আমি ওর সঙ্গে আলাদা কথা বলব। আগামীকাল কোনও প্র্যাকটিস হবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে হরিমাধবদা বললেন, 'সেকী! প্র্যাকটিস হবে না কেন?'

'কোচ নেই বলে।' সুনীলদা চট করে জবাব দিল।

'কোচ নেই বলে প্র্যাকটিস হবে না? এ কী কথা! তা হলে এতদিন ধরে এরা কী শিখল?'

সুনীলদা মাথা নাড়লেন, 'বেশ। হবে। প্র্যাকটিস হবে।'

স্বপ্নাশিষ একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এখন চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই হরিমাধবদার কথা বলছে। তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক না বেঠিক এই নিয়ে আলোচনা। একটু বাদে হরিমাধবদা টেন্ট থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরতে সে ওঁর সঙ্গী হল।

হরিমাধবদা বললেন, 'আজ তোর কোন খেলাটা আমার ভাল লেগেছে জানিস ? ওই নিশ্চিত আউট হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়ার পর যে খেলাটা খেললি ওইটেই খেলা উচিত। তোর সেই বেপরোয়া ভাব চলে গেল, তুই দলের জন্যে খেললি।'

স্বপ্নাশিষ চুপচাপ হাঁটছিল। একটু পরে হরিমাধবদা বললেন, 'তোর বয়স অল্প। কিন্তু তোর থেকে আরও কম বয়সে শচীন ইন্ডিয়া খেলেছে। আবার ডেভিডের কথা ভাব। তিরিশ বছরে ইন্ডিয়া ক্যাপ পেল। আমার বিশ্বাস তুই এবার বেঙ্গলে চান্স পাবি। বেঙ্গল টিমে যেমন ইন্ডিয়া টিমেও ঠিক তেমনই কোনও ওপেনার নেই। বিহার ওড়িশা অসমের সঙ্গে খেলাগুলোকে যদি কাজে লাগাতে পারিস তা হলেই অনেকটা এগিয়ে যাবি।'

স্বপ্নাশিষের এ সব ভাল লাগছিল না। সে বলল, হরিমাধবদা—।'

'হ্যাঁ, বল।'

'আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।'

'ছেড়ে যাচ্ছি কোথায় ? কোনও সমস্যায় পড়লেই এসে কথা বলবি।' হরিমাধবদা বললেন, 'তা তুই শ্যামবাজারে না খেলে বড় ক্লাবগুলোতে খেললেও আমার দরজা খোলা থাকবে।'

'আমি দলবদল করলে আপনি খুশি হবেন ?'

'যদি তোর মনে হয় যা চাইছিস তা শ্যামবাজার দিতে পারছে না তা হলে জোর করে পড়ে থাকলে মনের ওপর চাপ বাড়বে, সহজ খেলা খেলতে পারবি না। সে ক্ষেত্রে যারা তোর সাহায্যে আসবে তাদের কাছে যাওয়াই ভাল। তবে যেখানেই যাবি সৎ থাকবি। মাঠে নেমে কখনও ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি করিস না। মনে রাখিস বেইমানদের ইতিহাস কখনও ক্ষমা করে না।' হরিমাধবদা আবার হাঁটা শুরু করলেন।

আজ রাত হয়ে গিয়েছে বাড়ি ফিরতে। সে-কথা খেয়ালে এল বাড়ির সামনে এসে।

বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা। পা বাড়াতেই পিতৃদেব মুখ ফেরালেন, 'দাঁড়াও।'

স্বপ্নাশিষ স্থির হল। আজ যখন সবাই তাকে নিয়ে মাতামাতি করছে তখন পিতৃদেব গলার স্বর একটুও পাল্টাননি। গম্ভীর গলায় বললেন, 'এবাড়ির নিয়মগুলো জানা আছে ?'

হ্যাঁ। আজ ফাইনাল ছিল—।'

'খেলা ভেঙেছে সন্ধের অনেক আগেই। তুমি যত বড় খেলোয়াড়

হও না কেন যদি ভাবো তোমার জন্যে নিয়মগুলো বদলাবে তা হলে ভীষণ ভুল করেছ। এই শেষবার, এরপর আর আমি টলারেট করব না। কথাটা মনে থাকে যেন!'

'আচ্ছা!' স্বপ্নাশিষ পা বাড়াচ্ছিল ভেতরের দিকে, পিতৃদেব হাত তুলে তাকে থামালেন, 'ভদ্রতাবোধ, সৌজন্য এ সব কি নতুন করে শেখাতে হবে তোমাকে? আজ কী হল?'

'আমরা জিতেছি।'

'হুঁ! চ্যাম্পিয়ন হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভজুবাবুরা নিশ্চয়ই তোমার ওপর খুব রেখে গেছেন?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

'হাতে ওটা কী?'

'বোধহয় বই।' উত্তর দেওয়ামাত্র বুক ধক্ করে উঠল।

'কী বই?'

'খুলে দেখিনি। একজন দিয়েছে।'

'যাও।'

ঘরে ঢুকে অন্ধকারে একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকল সে। তার মনে হচ্ছিল এ বার পিতৃদেবের মুখের ওপর বলা দরকার এরকম ব্যবহার আর আপনার করা উচিত নয়। তার খুব রাগ হচ্ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা প্রকাশ করার কোনও উপায় ছিল না। আপনাকে আমি আগ বাড়িয়ে খেলার খবর দিইনি কারণ সে রকম সম্পর্ক বাল্যকাল থেকে আপনি রাখেননি। আমার যথেষ্ট সৌজন্যবোধ আছে কিন্তু আপনার কাছে সেটা দেখানোর আবহাওয়া আপনিই তৈরি করেননি।

আলো জ্বালল সে। তারপর প্যাকেটটা খুলতেই বইটা বেরিয়ে এল। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতা কী এ জিজ্ঞাসার কোনও আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এ টুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম।' প্রথম লাইনটা পড়ল সে। তারপরে সূচিপত্রের ডানদিকে সুন্দর হস্তাক্ষর, 'আজ যে সফল হবে কাল তাকে শুদ্ধ করবে এই কবিতাগুলো। আহির, সকাল সাড়ে দশটা।' পাতা ওল্টাল স্বপ্নাশিষ। কবিতা পড়ার অভ্যেস তার নেই। কোনওদিন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সে কবিতা পড়েনি। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎই নজর গেল আটকে। 'সারাদিন মিছে কেটে গেল/সারারাত বড্ডো খারাপ/'। সঙ্গে সঙ্গে মন কি রকম হয়ে গেল। সযত্নে বইটা রেখে ঠিক করল আগাগোড়া পড়ে ফেলতে হবে। যদি ভাল নাও লাগে তবু

পড়বে। আহির তাকে শুদ্ধ করার জন্যে এই বই দিয়েছে, শুদ্ধ হবে সে।

রাত্রে খেতে বসে তিনজনই একই নিয়মে খাচ্ছিল।

হঠাৎ পিতৃদেব বললেন, 'দেবু, তোমার ভাই-এর দল আজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কাল খবরের কাগজে নিশ্চয়ই ছবি বের হবে। তোমাদের মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই খুশি হতেন কারণ তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হতেন।'

খাওয়া থামিয়ে দেবাশিষ জিজ্ঞাসা করল, 'আরে, তুই বলিসনি কেন?'

'তুই পড়ছিলি তাই ডিস্টার্ব করিনি।'

'খুব ভাল খবর।' দেবাশিষ আবার খাওয়া শুরু করল।

'একজন ভাল খেলোয়াড় আর একজন ভাল ডাক্তারের মধ্যে কাকে মানুষের বেশি দরকার?' পিতৃদেব প্রশ্নটা করলেন।

মনে মনে তেতে গেল স্বপ্নাশিষ। জবাবটা সে-ই দিল, 'ডাক্তার।'

দেবাশিষ মাথা নাড়ল, 'প্রতিবছর সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার ডাক্তার তৈরি হচ্ছে। তাদের মধ্যে ভালদের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু প্রতি বছর একজন গাভাসকার বা শচীন বের হয় না যাদের খেলা মানুষকে আনন্দ দিতে পারে। একলক্ষ স্কিলড পার্সেনের চেয়ে একজন জিনিয়াস অনেক বেশি সম্মান দাবি করতে পারেন।'

তর্কে পেয়ে গেল স্বপ্নাশিষকে। পিতৃদেবের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসে এত কথা কখনও বলেনি তারা। সে বলল, 'যে গ্রামে মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা যায় তারা একজন ডাক্তারকে যে ভাবে চাইবে একজন খেলোয়াড়কে কখনও নয়।'

এ বার পিতৃদেব বললেন, 'ঠিক আছে।'

অর্থাৎ তোমরা চুপ করো। অনেক হয়েছে।

তিনি আজ বেশ আস্তে খাচ্ছেন, 'প্যাকেটে কী বই ছিল?'

দেবাশিষ তাকাল। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনতে পাওনি?'

স্বপ্নাশিষ জবাব দিল, 'একটা কবিতার বই।'

'অ্যাঁ? তুমি আজকাল কবিতাও পড়ো নাকি?'

'কবিতা পড়া কি খারাপ?'

'পাল্টা প্রশ্ন করছ দেখছি! হুঁ। মেয়েটি কে?'

চমকে উঠল স্বপ্নাশিষ, 'কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন?'

'আজ একাধিক মেয়ের সঙ্গে মিশেছ মনে হচ্ছে। খেলার শেষে ট্যাঁস সাজে যে মেয়েটা তোমাকে বই দিয়ে গেল তার কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

'আপনি, আপনি কী করে জানলেন?'

'শাট আপ! আবার প্রশ্ন।'

'আমি, আমি চিনি না।'

'শোনো, খেলোয়াড়দের চারপাশে সবসময় লোভের হাতছানি থাকে। বিশেষ করে যারা ক্রিকেট খেলে তাদের সম্পর্কে তো কত গুজব রটে। তুমি যখন মেয়েটিকে চেনো না তখন আর ওকে প্রশ্রয় দেবে না। ওর ভাবনাচিন্তা আমার ভাল লাগেনি।'

মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল স্বপ্নাশিষের। আহির যে মাঠে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিল সে খবর পিতৃদেব পেলেন কী করে ? কেউ কি দেখে এসে ওঁকে জানিয়েছে ? সে দেবাশিষের দিকে তাকাল। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে খেয়ে চলেছে। দাদাকে কি বাবা পাঠিয়েছিলেন ? তার মনে পড়ল এর আগের দিন এ বাড়িতে আসা কাগজে খবর না থাকা সত্ত্বেও পিতৃদেব ঠিকঠাক খেলার কথা বলেছিলেন। তবে কি উনি নিজেই আজ মাঠে গিয়েছিলেন ? অসম্ভব।

'কী ব্যাপার ? তোমার ভাবসমাধি হয়ে গেল নাকি ?'

'অ্যাঁ ?'

'এমন কী ভাবছ যে জগৎ বিস্মরিত ? তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলছ না তো ?'

'কী ব্যাপারে ?'

'ওই মেয়েটির ব্যাপারে ?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হলে এত চিন্তার কী আছে! আর যদি প্রমাণিত হয় তুমি মিথ্যেবাদী তা হলে এ বাড়িতে তোমার স্থান নেই, মনে রেখো।'

দেবাশিষ এতক্ষণ খেয়ে যাচ্ছিল, এবার বলল, 'স্বপ্ন সে রকম নয় বাবা।'

'কিরকম ?'

'আমরা দুজনে প্রায়ই আলোচনা করি ব্রহ্মচারী হয়ে থাকার ব্যাপারে।'

'তোমার কথা আলাদা। ডাক্তারি পড়ার সময় বলে দিয়েছিলাম, খবরদার, গাইনি হওয়ার চেষ্টা করো না, মেয়েদের সংস্পর্শে আসতে হবে, তুমি কথা শুনেছ! কিন্তু একে আমি সে রকম বিশ্বাস করতে পারছি না।' পিতৃদেব উঠে গেলেন।

ঘরে ফিরে মনে মনে খানিকটা সময় যুদ্ধ করল সে পিতৃদেবের সঙ্গে। হিটলারের সঙ্গে এবার তাকে যে লড়াই করতে হবে তার রিহার্সাল দিল। দাদার ওপর যত ইচ্ছে রোলার ঘোরাক ক্ষতি নেই কিন্তু সে এবার প্রতিবাদ করবে। মুশকিল হচ্ছে ওই মুখ সামনে এলে কথাগুলো কেমন

তাল পাকিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। সে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল তাকে তাড়াতাড়ি বড় হতে হবে। ক্রিকেট খেলে নাম এবং অর্থ উপার্জন করতে হবে। একমাত্র রাস্তা এটা। তা হলেই তার পক্ষে পিতৃদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব।

মনে মনে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে সে জীবনানন্দের বই-এর পাতা ওল্টাল। আজ যে সফল হল কাল তাকে শুদ্ধ করবে এই কবিতাগুলো। শুদ্ধ বলতে আহির কী বুঝিয়েছে সে জানে না কিন্তু তাকে কবিতাগুলো পড়তে হবে। প্রথম কবিতাটা পড়তে পড়তে সে থমকে গেল। এ তো তারই কথা—'অগণন যাত্রিকের প্রাণ/ খুঁজে মরে অনিবার, পায়নাকো পথের সন্ধান ;/ চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল।' আর এ থেকে মুক্তির উপায় কবি লিখেছেন, 'ভেঙে যায় কীট প্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক/ তোমার চকিত স্পর্শে।' নির্মোক মানে কী ? কবিতার বই সরিয়ে অভিধান দেখল সে। খোলস, বর্ম। চোখ বন্ধ করল স্বপ্নাশিষ। সত্যি তো। পিতৃদেবের শাসনের ফলে সে একধরনের বর্ম পরে রয়েছে। নিজের মুখ প্রকাশ করতে পারছে না। একমাত্র আহিরই পারে তাকে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে। জীবনানন্দকে খুব পছন্দ হল তার।

বেঙ্গল টিমে নির্বাচিত হল স্বপ্নাশিষ। খবর পেয়েই সে ছুটল হরিমাধবদার কাছে। তিনি জড়িয়ে ধরলেন, 'গুড। প্রথম খেলা কার সঙ্গে ?'

'ওড়িশার সঙ্গে কটকে।'

'বাঃ। এখন থেকে প্রত্যেকটা ম্যাচই তোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তুই যত ভাল খেলোড়াই হোস না কেন রান করতে না পারলে তোর কোনও মূল্য নেই।'

পিতৃদেব খবরটা শুনে বললেন, 'পড়াশুনা যাও বা এতদিন হচ্ছিল এখন সেটা শিকেয় উঠল। বাড়ির বাইরে গিয়ে রাত কাটাতে হবে, সাপের পাঁচ পা দেখো না।'

'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন ?' সাহস করে জিজ্ঞাসা করল সে।

'করি।'

মুখের ওপর জবাব পেয়ে অবাক হয়ে তাকাল স্বপ্নাশিষ, 'কেন ?'

'বিকজ তুমি সাবালক হয়ে গেছ, নোংরা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করছ। ভাবতেই আমার শরীর গুলিয়ে ওঠে। কথাটা তোমাকে বলতেও আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু আজ যখন প্রশ্ন করলে তখন জিজ্ঞাসা করছি

মেয়েটা কে ?'

বুকের ভেতর ভূমিকম্প শুরু হল, 'কার কথা বলছেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের টেবিল থেকে একটা বই তুলে কাগজটা বের করলেন তিনি, 'পড়ো, জোরে জোরে পড়ো। দেবু, দেবু! এ দিকে এসো, কুইক।'

দেবাশিষ ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ানোর পর কাগজটা হাতে দিলেন, 'নাউ, স্টার্ট।'

কাগজটার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল স্বপ্নাশিষ। এটা পিতৃদেবের হাতে পৌঁছাল কী করে ? সে এটাকে নিজের ঘরে অভিধানের মধ্যে রেখেছিল।

'বোবা হয়ে থেকো না। পড়ো!' শব্দটা আছড়ে পড়ল।

'এটা আমার নয়।'

'আবার আর্গুমেন্ট। পড়তে বলছি, পড়ো।'

'এ চিঠি আমার নয়, আমি পড়তে পারব না।'

ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে পিতৃদেব দেবাশিষকে দিলেন, 'তুমি পড়ো।'

দেবাশিষ পড়ল, 'মাই ডার্লিং। আই লাভ ইউ! তোকে ছাড়া আমার দিল দেওয়ানা। গত শনিবার তুই আমাকে গ্রেসে সিনেমা দেখালি। মনে হচ্ছিল আমি মাধুরী আর তুই অজয়। আ গলে লাগ যা। কিন্তু ডার্লিং—।'

'শাট আপ। উঃ। কী ইতর ভাষা, ছি ছি ছি।'

'প্রচুর বানান ভুল।' দেবাশিষ পিতৃদেবের বাড়ানো হাতে চিঠি ধরিয়ে দিল।

'অশিক্ষিত! আনকালচার্ড! এই সব নোংরা মেয়ের সঙ্গে তুমি মিশছ ? লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রেসে সিনেমা দেখতে যাওয়া হচ্ছে। পাপ কখনও চাপা থাকে না। পাপী ভুল করবেই। তাই ডিকসনারিতে রেখেছিলে এটা। হুঁ হুঁ, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া ?'

'এ চিঠি আমার নয়।'

'আবার মিথ্যে কথা। লায়ার!'

'আমার কথা বিশ্বাস না করলে আপনি কেলোর মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

'কেলোর মা ? তাকে কেন জিজ্ঞাসা করব ?'

'ওই চিঠি কেলোর মা-ই আমাকে দিয়েছে।'

'আই সি। স্যাক হার। আজই ওকে তাড়াব। দূতীর কাজ করছে বুড়ি। কেলোর মা!' বজ্র-কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লেন পিতৃদেব।

কেলোর মা যে কাছাকাছি ছিল তা বোঝা গেল তার দ্রুত প্রবেশে।

'গেট আউট। নিকালো হিঁয়াসে। ওদের মা চলে যাওয়ার পর থেকে তোমার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে কী ভুল করেছি! ওই ছেলেটার মাথা খাচ্ছ তুমি?'

'আমি আবার কী করলাম?'

'এই চিঠি এ বাড়িতে আনোনি তুমি?'

'ওটা কী চিঠি?'

'মাই ডার্লিং, আ গলে লাগ যা। কে লিখেছে, নাম কী তার?'

'বিন্দু।'

'বাঙালি? এই নাম? ছি ছি, তার চিঠি এ বাড়িতে বয়ে এনেছ তুমি?'

'অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আমার মাথা ঠিক ছিল না তখন।'

'আমার মাথা এখন ঠিক নেই। তোমাকে কাল থেকে আর কাজে আসতে হবে না।'

'সেকী? কেন? আমি তো বললাম আমার মাথা ঠিক ছিল না।'

'ওটা কোনও কৈফিয়ত নয়। ব্রিং দ্যাট গার্ল। ওই বিন্দুকে নিয়ে এসো এখানে।'

'সে তো নেই।'

'নেই মানে?'

'কেলো ওর সঙ্গে সম্পর্ক কাটান দেবার পর কোন মাসির বাড়ি চলে গেছে।'

'এর মধ্যে কেলো আসছে কোত্থেকে?'

'তার মানে? কেলোর সঙ্গে ভাব হচ্ছিল বলে তো আমার মাথা—।'

'দাঁড়াও। এ চিঠি বিন্দু কাকে লিখেছিল?'

'কেলোকে।'

'হুম। তা হলে চিঠিটা এ বাড়িতে এল কেন?'

'দাদাবাবুকে দিয়ে পড়াতে এনেছিলাম। কেলোর পকেটে পেয়েছিলাম ওটা। দাদাবাবুর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম কেলোকে ফেরাতে। তা বলতে নেই, কদিন পরে কেলো আমার সামনে বিন্দুকে বলে দিল কোনও সম্পর্ক নেই।'

পিতৃদেব এ বার স্বপ্নাশিষের দিকে ফিরলেন, 'বাঃ। অনেক গুণ হয়েছে দেখছি। অ্যাডভাইসার হয়েছ! এ সব ব্যাপার সমাধান করছ। তলে তলে এত উন্নতি হয়েছে ভাবতে পারিনি। নো মোর, এ সব ব্যাপারে একদম থাকবে না, দ্যাটস মাই অর্ডার। আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গিয়েছে তোমার ব্যাপার দেখে। যাও, যাও তোমরা।'

হঠাৎ স্বপ্নাশিষ নিজেকে বলতে শুনল, 'আপনি অকারণে উত্তেজিত হন।'

'হোয়াট ?' পিতৃদেবের গলার স্বর ফ্যাসফেসে হয়ে গেল ?

আর ফেরার পথ নেই। তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গেলে সেটা এগিয়ে যাবেই যতক্ষণ জোর থাকে।

'আপনি নিজে যা ভাবেন সেটাকেই ঠিক মনে করেন। আমরা বড় হয়েছি, আমাদের কিছু বলার থাকতে পারে তা আপনি চিন্তা করেন না। সেই জন্যেই আপনার প্রেসার বাড়ে !'

'তুমি তু-মি আমার মুখের ওপর এ সব কথা বলছ ?'

'আমি আপনাকে একটুও অশ্রদ্ধা করছি না। এই দেখুন না, আপনি ওই চিঠিটাকে আমাকে লেখা ভেবে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করছিলেন। ঠিক কি না !'

'এ বাড়ির একটা ডিসিপ্লিন আছে—।'

'নিশ্চয়ই। আমরা সবাই সেটা মেনে চলি। কিন্তু আপনি যখনই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তখনই রেগে রেগে বলেন কেন ? কেলোর মা বলছিল মায়ের সেই বোন যেদিন এসেছিল সেদিন আপনি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলেন। তা হলে আপনি সেটা হতে পারেন।'

'তার মানে আমি ইচ্ছে করে অস্বাভাবিক হই ?'

'সেটা আপনি জানেন। আমার খেলা দেখতে গিয়েছেন অথচ এমন ভান করেছেন নিজে যাননি। বলুন, সত্যি কিনা ?' পায়ের তলায় যেন মাটি পাচ্ছিল স্বপ্নাশিষ।

'অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! তোমাদের বলেছিলাম মাসির সঙ্গে দেখা করে আসতে। গিয়েছ ? কোনও কথা শোনো ? আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনানো হচ্ছে ! যাও, আমাকে একা থাকতে দাও।' হাত নাড়লেন পিতৃদেব। দুপায়ে ডানা বেঁধে যেন ঘরে ঢুকল সে। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছিল, লাফিয়ে নিল। উঃ, অনেকদিন ধরে মনে যে ইচ্ছেটা বড় হচ্ছিল আজ সেটা পূর্ণ করতে পেরেছে। কোনও প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারেননি উনি। যেন একটা বিরাট যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে সে এমন ভঙ্গিতে দরজার দিকে তাকাতেই সে দেবাশিষকে দেখতে পেল। দেবাশিষের মুখ দেখার মতো।

দেবাশিষ বলল, 'তুই, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ?'

'না তো। মনে হচ্ছে নাকি ?'

'তুই বাবার সঙ্গে ওইভাবে কথা বললি ?'

'খারাপভাবে বলিনি। যা ন্যায় তাই বলেছি।'

'ন্যায় অন্যায় বিচার করার তুই কে ? এমনিতেই মাথা গরম থাকে, তোর কথা শুনে যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে ?'

'এখন থেকে শান্ত হয়ে যাবে। কখনও কখনও একজনকে এগিয়ে গিয়ে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে হয়। যাক গে, কালই তুই সেই মাসির বাড়িতে যাবি।'

'কেন ?'

'বাঃ। তুই বাবার বাধ্য ছেলে। পিতৃ আদেশ লঙ্ঘন করা অপরাধ !'

'তুই যাবি না ?'

'আমি কী করে যাব ? কাল থেকে কড়া প্র্যাকটিশ।' জীবনানন্দ দাশের বইটা টেনে নিল সে, 'একটা কবিতা শুনবি দাদা !'

দেবাশিষ বিরক্ত হয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে গেল।

আহির বলল, 'কেমন আছেন ?'

কফি হাউসের টেবিলে বসে স্বপ্নাশিষ মাথা নাড়ল, 'ভাল।'

'বইটা খুলেছিলেন ?'

'পুরোটা পড়া হয়ে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে আরও কয়েকবার পড়তে হবে।'

'সেকী ? কেন ?'

'আচ্ছা, আপনি যখন প্রথম পড়েছিলেন একবারেই সব বুঝেছিলেন ?'

'না। যতবার পড়ি ততবার বুকের ভেতরটা অন্যরকম হয়ে যায়।'

'তা হলে ? আমার মত মুর্খ একবারে কি বুঝবে ?'

'নিজেকে মুর্খ ভাবছেন কেন ?'

'মানুষ যতক্ষণ শুদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ মুর্খ থাকে।'

এবার চোখ তুলল আহির, 'আপনি ঝগড়া করতে ভালবাসেন, না ?'

স্বপ্নাশিষ হেসে ফেলল, 'একদম না।'

আহির হাসল, 'আজকের কাগজ দেখে আপনার বাবা কিছু বলেননি ?'

'না। ওঁর স্বভাব ভাল দেখলে হজম করে যাওয়া, খারাপ দেখলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া।' আপনি তো দেখেননি। একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তবু কাল আমি প্রথম মুখ খুলেছি। সাহস করে তো বলে ফেললাম।'

'কী ?'

স্বপ্নাশিষ ঘটনাটা বলতেই আহির হেসে উঠল, 'মজার মানুষ তো !'

'মজা ! আপনার সঙ্গে আলাপ হলে বুঝতে পারবেন।'

'বেশ। আপনার বাড়ির ঠিকানা দিন, একদিন গিয়ে আলাপ করে আসব।'

'সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ কেন ?'

'আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।'

'আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাড়ি থেকে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে ?'

'প্রায় তাই।'

'তা হলে সম্পর্ক না রাখাই আপনার পক্ষে মঙ্গল।' আহিরের মুখে মেঘ ঘনাল।

'অসম্ভব।'

'বুঝতে পারলাম না।' আহির বলল, 'আমার কোনও বন্ধুর ক্ষতি আমি চাই না।'

স্বপ্নাশিষ মুখ তুলে তাকাল। আহিরের চোখে চোখ রাখল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি কোনও কিছুর বিনিময়ে এই বন্ধুত্ব হারাতে চাই না।'

'আমি কিভাবে বিশ্বাস করব ?'

বিশ্বাস ! কিভাবে কাউকে করানো যায় ? স্বপ্নাশিষ অসহায় চোখে তাকাল। চিৎকার করে বললেও তো মানুষকে বিশ্বাস করানো যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে লিলি টমসন আক্রামের বলের মুখোমুখি হওয়া ঢের সোজা।

স্বপ্নাশিষকে ভাবতে দেখে আহির বলল, ' তোমার বাবা যদি জানতে পারেন তা হলে নিশ্চয়ই তুমি বিপদে পড়বে। তখন, তখন তো তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করতেও পারো।'

দু-দুটো বিশ্বরেকর্ড পকেটে নিয়ে ভারতবর্ষে এসে লারা ব্যাটে রান পায়নি। কবে কখন কী হবে এটা কখনওই আগ বাড়িয়ে বলা যায় না। পাকিস্তান যে শারজায় শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যাবে তা কি কেউ জানত ? কিন্তু স্বপ্নাশিষ নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করল, 'তুমি আমাকে ত্যাগ করলেও আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব না।'

'প্রমিশ ?'

'প্রমিশ।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম।'

'কী করে ?'

'জানি না। কখনও কখনও বিশ্বাস করতে ভাল লাগে। তাই।'

৪

সে রাতে ঘুম এল না। কখন যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে কথাবার্তা বিছানায় শুয়ে সেটাই মনে করতে পারছিল না স্বপ্নাশিষ। এখন বুক জুড়ে অসম্ভব এক ভাললাগা পাহাড়ি ঝরনার মতো তরতরিয়ে ছুটে চলেছে। যার কোনও অন্ত নেই। একেই কি প্রেম বলে! এখন যদি আহির তার কাছে একটা বিন্দু চায় তা হলে সমুদ্র দিয়ে দিতে পারে। জানলার বাইরে রাতে আকাশটাকে দেখল সে। শ্যামনগরের আকাশটা কি এখন এই রকম দেখাচ্ছে? আহির কি ঘুমাচ্ছে? 'ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে/বসন্তের রাতে/বিছানায় শুয়ে আছি/এখন সে কত রাত!'

বন্ধ চোখে আহিরের মুখ, ওর উজ্জ্বল চোখের আলো, চিবুকের ভাঁজে শৈশব, চুল—। হঠাৎ মনে হল সে বিদিশার নিশা শব্দ দুটোর অর্থ ধরতে পেরেছে। আর মনে হওয়া মাত্র বিছানায় উঠে বসল সে। জীবনানন্দের বইটা খুলল টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে। বনলতা সেন কবিতাটা প্রথম পড়ার সময় ভাল লেগেছিল সব উপমার সঠিক ব্যাখ্যা পায়নি। এখন যেন একটু একটু করে পেতে লাগল। তার মনে হল জটিল অঙ্ক সমাধান করার জন্যে যেমন ফর্মুলা আছে তেমনি কবিতা বোঝার জন্যে যে ফর্মুলা দরকার হয় তার নাম অনুভূতি, বোধ। জীবনানন্দ যেন আহিরকে দেখেছিলেন। এই বই-এর অনেক কবিতাই তাই আহিরকে লক্ষ্য করে, তাকে ভেবে লেখা। আজ সেই লাইনগুলো পড়ার সময় সে আহিরকে স্পর্শ করতে পারছে। কবি আর পাঠক এখন একাকার হয়ে এক সমুদ্রের দিকে এগিয়ে বলেছে যার নাম আহির।

একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মারা যাওয়াতে আজ সব ছুটি। আহির তাই কলকাতায় আসবে না, ময়দানে খেলাও বন্ধ। দুপুরে খেতে বসে পিতৃদেব বললেন, 'ধ্যাৎতামো। রাষ্ট্রপতির চাকরি চলে যাওয়ার পর যে লোকটার কথাবার্তা সরকারকে বিব্রত করত, যাকে কেউ পাত্তা দিত না, সে পটল তুলতেই চারধারে প্যাঁ পোঁ শুরু হয়ে গেল। শোক উথলে উঠছে যেন।'

ছেলেরা চুপচাপ খাচ্ছিল। এই ধরনের উক্তিতে তাদের কিছু এসে যায় না। দেশ আছে বলে একটা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, যাবেন, আর একজন আসবেন। এর সঙ্গে তাদের কোনও সংযোগ নেই। পিতৃদেবের উষ্মার সঙ্গে তাই তারা যোগ দিল না। অবশ্য যোগ

দিতে গেলে কথা বলতে হয়। সেই ঝুঁকি নিতে ওরা কেউ চায় না।

'বাবু।' কেলোর মা একটু দুরে এসে দাঁড়াল।

পিতৃদেব মুখ ফেরালেন।

'আমাকে দুদিন ছুটি দিতে হবে।' কেলোর মা নিচু গলায় বলল।

'ছুটি ? হোয়াই ? কেন ?'

'আমি একটু তারাপীঠে যাব।'

'সেকী ? ওখানে কে আছে তোমার ?'

'মা আছেন। মায়ের কাছে যাব।'

'তোমার মা ? সে রকম কেউ আছে বলে জানতাম না তো !'

'আমার মা কেন হবে ? মা কালী।'

'মাই গড ? তাকে পুজো দেবার কী হল ?'

'আমাকে যেতে হবে বাবু। তিনি বড় জাগ্রত।' কেলোর মা বলল, 'ছেলেটার ঘাড়ে আর একটা পেত্নী চেপেছে। তারাপীঠে পুজো না দিলে যোগ কাটবে না।'

পিতৃদেব গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'হুঁ। তা আমরা কি হাওয়া খেয়ে থাকব ?'

'আমার উপায় নেই বাবু। এত বছর ধরে আমি তো কখনও ছুটি নিইনি। জ্বর গায়ে এসে কুঁড়িয়ে কুঁড়িয়ে রান্না করেছি। মা বলে গিয়েছিল, কেলোর মা, এদের দেখিস, দেখিনি ?'

'কিন্তু আমাদের কী হবে ? এই বয়সে হোটেলের রান্না খেতে পারব না।'

'তা তো জানি। আমি দুদিনের জন্যে বনলতাকে দিয়ে যাচ্ছি, সে রেঁধে দেবে। চট করে তো বদলি পাওয়া যায় না। বনলতা সামনের মাস থেকে মল্লিক বাড়িতে লাগবে, এখন বসে আছে বলে রাজি হল। যাব ?'

'চোর ছ্যাঁচোড় নয় তো ? বয়স কত ?'

'চোর না। বয়স একটু কম, বাইশ তেইশ।'

নো। নেভার। 'পিতৃদেব চমকে উঠলেন।'

'মানে ?'

পিতৃদেব সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'অল্পবয়সী মেয়ে রাখব না তা তুমি জানো না ?'

'দুদিন তো। আর কাউকে পাব না আমি। তা ছাড়া বনলতার চরিত্র ভাল।'

কবে যাবে ?'

'কাল।'

'একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে কথা বলতে এসেছ। অ্যালাউ না করলে বদনাম করবে। ঠিক আছে, বিকেলে নিয়ে এসো তাকে, কথা বলে দেখি।'

বিকেল চারটের সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কিছু ভাবনাকে কাগজে লিখে ফেলল স্বপ্নাশিস। এবং তখনই কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। কেলোর মায়ের ফিরে আসার সময় এখনও হয়নি। দরজা খোলার শব্দ কানে এল, পিতৃদেবই খুললেন।

মিনিট পাঁচেক পরে হাঁকটা এল। পিতৃদেব তাকে ডাকছেন। লেখা বন্ধ করে খাতাটাকে অন্য বইপত্তরের আড়ালে ঢুকিয়ে স্বপ্নাশিষ পিতৃদেবের ঘরের দিকে যেতে যেতে একটি মহিলাকণ্ঠ শুনতে পেল, 'অত জোরে চিৎকার করে কথা বলবেন না, শরীর খারাপ হবে।'

'হেঁ হেঁ। তা অবশ্য।' তা অবশ্য। সম্পূর্ণ অচেনা গলায় পিতৃদেব কথা বলছেন। বিস্ময়ের অন্ত রইল না। স্বপ্নাশিষ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

'এই যে! ইনি আমার কনিষ্ঠ পুত্র।'

স্বপ্নাশিষ দেখল একজন প্রায় প্রৌঢ় মহিলা চেয়ারে বসে আছেন। মোটাসোটা, চোখে চশমা, একসময় সুন্দরী ছিলেন, হালকা নীল শাড়িতে কাজ।

'তোমার মাসিমা। কতবার বললাম গিয়ে দেখা করে এসো। অবাধ্য।'

'ওভাবে বলছেন কেন? ব্যস্ত থাকে বলে যেতে পারেনি। তুমি তো ক্রিকেট খেলো?'

চুপচাপ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল স্বপ্নাশিস।

'আজকাল তো শুনেছি ক্রিকেট খেলে অনেক টাকা পাওয়া যায়।'

'খেলে টাকা রোজগার করে গলফ প্লেয়ার আর টেনিস প্লেয়ার।' পিতৃদেব জানালেন।

'এ কিন্তু দিদির মতো দেখতে হয়েছে।'

'সেই জন্যে আমার দুশ্চিন্তা বেড়েছে।'

'কেন?'

'আমি যা পছন্দ করি না তাই ইনি করেন।'

'সেকী! বাবা তোমাদের কত কষ্ট করে বড় করেছেন তাঁকে দুঃখ দিচ্ছ কেন?'

'আমরা দুঃখ দিচ্ছি তা আপনি জানলেন কী করে?' সরাসরি প্রশ্ন

করল সে।

'এই তো উনি বললেন।'

'উনি ওরকম ভাবতে ভালবাসেন!'

'হোয়াট? আমাকে, আমাকে অপমান করার সাহস পেয়েছ তুমি?' চিৎকার করে উঠলেন পিতৃদেব। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা হাত তুললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত হলে আপনার প্রেসার বেড়ে যাবে।'

'বাড়ুক প্রেসার। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই।'

'বেশ, তা হলে তাই করুন। আমি যাচ্ছি।'

'না না, তুমি বুঝতে পারছ না, ভুবন, ডিসিপ্লিন ইজ লাস্ট ওয়ার্ড—।'

'ঠিক আছে। আগে আপনি শান্ত হোন—।'

'বেশ। তুমি কথা বলো। জবাবদিহি চাও।' পিতৃদেব মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এই পিতৃদেবকে স্বপ্নাশিষ প্রথম দেখল। ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'আমি অন্যায় কথা কিছু বলিনি।'

'উনি কি ভুল বললেন?'

'ভাবছেন যা তাই বলছেন।'

'ঠিক আছে। তোমার দাদা কোথায়?'

'হাসপাতালে গিয়েছে।'

'তা হলে তোমরা ওঁকে দুঃখ দাও না।'

'না।'

'ব্যস চুকে গেল। এখন ওরা বড় হয়েছে, ওদের কথা তো শুনতে হবে আপনাকে!'

পিতৃদেব ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ ফেরালেন।

'যাই বলুন, আপনি বড্ড রাগী।'

'মোটেই না।'

'মানব না। দিদির কাছে শুনেছি চায়ে চিনি বেশি হয়েছিল বলে আপনি কাপ ছুড়ে ভেঙে ফেলেছিলেন। কি ঠিক কি না?'

'তোমার দিদি তিলকে তাল করত।'

দরজায় শব্দ হল। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

'আমি বনলতা।'

'বনলতা? ও। এসো, ভেতরে ঢোকো।'

যে মেয়েটিকে ওরা দেখতে পেল তাকে আর যাই হোক বাড়ির কাজের লোক বলে মনে হয় না। কায়দা করে শাড়ি পরা, সংক্ষিপ্ত জামা,

চুল ফাঁপানো, হাতে ছোট ব্যাগ।

'তোমাকে কেলোর মা পাঠিয়েছে ? সে কোথায় ?'

'সে আমাকে ছটার সময় আসতে বলেছিল, তখন টাইম হবে না বলে এখন এলাম। কেলোর মা আমাকে কী কী করতে হবে বলেছে। আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'তুমি কি ম্যারেড ? মানে বিয়ে থা হয়েছে ?'

'আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। কাল সকালেই আসতে হবে ?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পিতৃদেব ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'আমার বাড়িতে যে পার্মানেন্টলি আছে, সেই তোমার দিদির আমল থেকে, সে দুদিনের জন্যে ছুটিতে যাচ্ছে। তার বদলি একে পাঠিয়েছে। হাত পুড়িয়ে বাবুরা কেউ তো রান্না করতে পারে না।'

ভদ্রমহিলা বনলতাকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। আজই তোমাকে খবর দেব। আমরা একটু কথা বলে দেখি।'

বনলতা যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল।

'কী সাজগোজ ! এ কাজ করবে কখন ?'

'দুদিন তো।'

'দুর্নাম দিতে তো এক মিনিট লাগে। এ বাড়িতে যদি আর কোনও মহিলা থাকত তা হলে তো প্রশ্ন ছিল না। নাঃ, এ মেয়েকে দিয়ে চলবে না। হোটেলের খাবার খেতে হবে।'

'কী আশ্চর্য। হোটেলের খাবার খাবেন কেন ?'

'একে রাখলে আমার প্রেসার আরও বেড়ে যাবে।'

ভদ্রমহিলা একটু ভাবলেন, 'আপনার এখানে এক্সট্রা ঘর আছে ?'

'এক্সট্রা ঘর কী হবে ?'

'আমার তো কোনও ঝামেলা নেই, দুদিন আমি এখানেই থেকে যেতে পারি।'

'তুমি ?'

'হ্যাঁ, অসুবিধে আছে ?'

'আরে, আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার আত্মীয়স্বজন—।'

'আপনিও তো আমার আত্মীয়।'

'তা বটে। তা হলে বনলতাকে রেখে দেওয়া যেতে পারে, কী বলো ?' শেষ প্রশ্নটা তিনি স্বপ্নাশিষের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলেন।

স্বপ্নাশিষ বলল, 'আমি যেতে পারি !'

'মানে ? তোমরা বড় হয়েছ, তোমাদের মতামত জানতে চাইছি !'

'আমার কোনও মতামত নেই।' ভেতরে পা বাড়াল সে।

'দেখলে ভুবন, কী নিয়ে আছি। আমার বড় ছেলেকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। একেবারে মাটির মানুষ। এই হতচ্ছাড়া ক্রিকেট খেলে এ রকম হয়েছে।'

'হয় তো আমাকে পছন্দ করছে না।'

'অপছন্দ করার মতো কিছু করোনি তুমি। তা হলে তো নিজের মাকেই ও অপছন্দ করত। মাসি আফটার অল মায়ের বোন।'

'আহা, নিজের মাসি তো নই।' হাসলেন মহিলা, 'যাই বলুন, দিল্লি থেকে এখানে এসে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। এই দুদিন একটু অন্যরকম লাগবে। চলুন, আপনার বাড়ির ভেতরটা দেখে আসি।'

'যাও না। কেউ তো নেই। থাকবে যখন তখন ভাল করে নিজেই দেখে নাও।'

স্বপ্নাশিষ দ্রুত পা চালিয়ে নিজের ঘরে চলে এল।

ভদ্রমহিলার আগ বাড়িয়ে উপকার করাটা সে পছন্দ করতে পারছে না কেন ? ওই বয়েসের এক মহিলা হুট করে এত স্বল্পপরিচিত বাড়িতে থেকে যেতে কী করে রাজি হলেন ? যে পিতৃদেব মহিলাদের ছায়া মাড়াতে নিষেধ করতেন তিনি কী করে সম্মতি দিলেন ! তার কেলোর কথা মনে হল। বনলতাকে দেখে মনে হয়েছে খুবই আধুনিকা। ওদের মধ্যে এমন মেয়ে খুব কম দেখা যায়। কেলো যে রেটে প্রেম করে তার হাত থেকে বনলতা কী করে রক্ষা পেল ? বনলতাকে সমর্থন করছে যখন কেলোর মা তখন তার ছেলে সম্পর্কে কোনও ভয় নেই। কেলোকে অন্য প্রেম করা থেকে বিরত করতেই সে তারাপীঠে পুজো দিতে যাচ্ছে। পুজো দিলে এ সব করা যায় ? যে দেশের মানুষ সূর্য চন্দ্র গ্রহণে খাবারে তুলসী পাতা খোঁজে সে দেশে কেলোর মায়েরা এ রকম ভাবতেই পারে।

'এইটে তোমার ঘর ?'

মুখ ফিরিয়ে সে মহিলাকে দেখল, দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

'ইস, কী অগোছালো করে রেখেছ। দুদিন আছি তো, সাজিয়ে দেব। তোমার ছবি নাকি কাগজে ছাপা হয়েছে ? খুব ভাল খেলো বুঝি ?'

'এখানে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে।' স্বপ্নাশিষ বলল।

'কেন ?' ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে তাকালেন।

'আমার বাবা কতগুলো আইন এ বাড়িতে চালু করেছেন। যেমন

বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ের খাবার সেই সময়ে না এলে পাওয়া যাবে না। জোরে কথা বলা যাবে না। কেলোর মাকে মহিলা হিসেবে মনে করা হয় না, তাই মহিলাদের ছায়া এড়িয়ে যেতে হবে। আমার দাদা ব্রহ্মচারী, ও আপনার ছায়া মাড়াতে চাইবে না। সেটা কি আপনার ভাল লাগবে ?'

'ও মা ! তাই নাকি ?'

'তাই। কয়েক মিনিটের জন্যে শ্বশুরবাড়ির লোক হিসেবে এসেছেন বলে বাবা আপনার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন, একটু পুরনো হলেই দেখতে পাবেন।' খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল স্বপ্নাশিষ।

'তা তো হবেই। আসলে দিদি মারা যাওয়ার শোকে পাথর হয়ে গেছে মানুষটা। এ বেশিদিন থাকবে না। তোমাদের বিয়ে থা হয়ে গেলে বদলে যাবে।'

'আমাদের তো বিয়েই হবে না।'

'ওমা ! কেন ?'

'দাদা পিতৃ-আদেশে ব্রহ্মচারী থাকবে। আর আমি ও সব ভাঙলে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।'

মহিলা শব্দ করে হাসলেন, 'এ সব শুনেছি সিনেমায় হয়। তোমাদের বাড়িটা দেখছি বেশ মজার। ওটা কী বই ?' উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই তুলে নিলেন ভদ্রমহিলা।

'ও, কবিতার বই। আমি আবার কবিতা বুঝি না। আজ যে সফল হবে কাল তাকে শুদ্ধ করবে এই কবিতাগুলো। আহির। আহির কে ?' মুখ তুললেন মহিলা।

নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্নাশিষ। কোনওমতে বলল, 'বন্ধু।'

'এ রকম নাম কখনও শুনিনি। হাতের লেখা মেয়েলি। অবাঙালি ?'

'না।'

'এই কবিতাগুলো পড়লে শুদ্ধ হওয়া যায় বুঝি ?'

'হ্যাঁ। মন পবিত্র হয়। গীতা বা উপনিষদের চেয়ে ভাল।'

'তুমি গীতা পড়েছ ?'

'না পড়লে বলছি কী করে ? ছেলেবেলায় ও সব বাবা আমাদের পড়িয়েছেন।'

'তা হলে তো এই বইটা পড়তে হবে। দেবে আমাকে।'

'এ বাড়িতে যতক্ষণ আছেন পড়ুন, নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'তুমি বড্ড কাঠ কাঠ কথা বলো।'

'বাবা বলেছেন সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলা ভাল।'

ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে বইটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আজ বিকেলের জলখাবার মুড়ি আর শশা। কেলোর মা বাটিটা ঘরে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'তিনি কি এখন থেকে এখানে থাকবেন ?'

'কেন ?'

'তোমার দাদা বাড়ি ফিরতেই তাকে কোথায় পাঠানো হল ওঁর জিনিসপত্র আনতে। তোমরা বড় হয়েছ, এখনই প্রতিবাদ করো। বাবুর বয়সটা ভাল নয়।'

'তার মানে ?'

'ওঃ, তোমাকে কী করে বোঝাব ! ওই শয়তানীর মতলব ভাল নয়।'

'তুমি কী করে বুঝলে ?'

'বুঝব না ? আমাকে বলছে বাড়ি চলে যেতে, আজ রাত্রের রান্না নাকি সে-ই রাঁধবে। কেন ? আমার কাল থেকে ছুটি, আমি আজই বাড়িতে যাব কেন ?'

'মায়ের বোন বলে কথা !'

'ছাই। কোনওদিন দেখিনি। এ আমার ভাল লাগছে না বাপু।'

'বাবাকে গিয়ে বলো।'

'তিনি কি কানে শুনবেন ? বাবুর নাম ধাম গোত্র একটা কাগজে লিখে দাও তো !'

'কী হবে ?'

'তারাপীঠে গিয়ে বাবুর নামেও একটা পুজো দিয়ে দেব।'

হোহো করে হেসে উঠল স্বপ্নাশিষ। কেলোর মা বোকা বোকা মুখ করে তাকিয়ে থাকল। হাসি থামিয়ে স্বপ্নাশিষ বলল, 'তোমার বনলতা এসেছিল। ওর সঙ্গে কেলোর বিয়ে দাও না।'

'তোমাকে সত্যি কথা বলব ?'

'নিশ্চয়।'

'আমি প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। আমাকে খুব মান্যি করে, হয় তো একবার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তাতে কী ! কিন্তু কেলোর কাঁধে অন্য পেত্নী চেপেছে।'

'তা হলে তো মুশকিল। সেই পেত্নী কি সুন্দরী ?'

'দূর। বাঁশের মতো দেখতে। যার তরে মজে মন কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। মাঝে মাঝে মনে হয় কেলোকে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে মারি আচ্ছাসে। কিন্তু তারকেশ্বরে মানত করে যে ছেলেকে পেয়েছিলাম তার গায়ে ঝাঁটা তুলি কি করে ?'

'তারকেশ্বরে শুরু করেছিলে এখন যাচ্ছ তারাপীঠে এরপর কোথায় ?'

খোঁচাটা বুঝতে পারল কেলোর মা। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ করে স্বপ্নাশিষ ভাবল একবার দেশবন্ধু পার্ক থেকে ঘুরে আসবে। পোশাক বদলে বাইরের ঘরের দিকে যেতে সে থমকে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা কবিতা পাঠ করছেন—', বলিলাম—'একদিন এমন সময়/ আবার আসিও তুমি— আসিবার ইচ্ছা যদি হয়—/ পঁচিশ বছর পরে।' পড়ব?'

'ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আহিরটা কে?'

'আপনার কী দরকার? বড্ড সন্দেহবাতিক আপনি।'

'তা নয়। হঠাৎ এই বই দিতে গেল কেন?'

'দোষ কি?'

'না। পঁচিশ বছর আগের ঘটনা যে বলছে তার তো বয়স হয়েছে।'

'কী আর বয়স। আমার মতো। দিদির চেয়ে কয়েক বছরের ছোট।'

'আর দিদি। তিনি চলে গিয়ে আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন।'

'কখনও ডোবা কখনও ভাসা—এই তো জীবন!'

'হুঁ। কিন্তু কুড়ি বছর আগের ওই সব ব্যাপারের কবিতা পড়ছে কেন ছোকরা। না, এটা বন্ধ করা দরকার। কথা বলতে হবে!' পিতৃদেবের কণ্ঠস্বর বদলে গেল।

'ও। স্বপ্নাশিষ যদি ওর বয়সী প্রেমের কবিতা পড়ত তা হলে খুশি হতেন?'

আঃ। ভুবন!'

'দেখুন, যে বয়সের যা। ওদের স্বাভাবিকভাবে বড় হতে দিন তো! কিছু বলবেন না। আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগছে কবিতাগুলো। এতদিন যে কেন পড়িনি!'

স্বপ্নাশিষ আর দাঁড়াল না। পর্দা সরিয়ে দুজনের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

৫

ভদ্রলোকের নাম সুঁটে সেন। রোগা লম্বা, অনেকটা শকুনের মতো ভঙ্গি। বড় ক্লাব কোহিনূরের সেক্রেটারি। ময়দানের সবাই জানে সুঁটে সেন মানেই কোহিনূর, কোহিনূর মানেই সুঁটে সেন। বিশাল ব্যবসা তাঁর, দু হাতে টাকা ঢালেন ক্লাবে, বিরোধীপক্ষ বলে কাউকে তৈরি হতে দেননি। রোজ বিকেলে ক্লাবের লনে বসে থাকেন ইজি চেয়ারে।

তাঁবেদাররা চার পাশে ভিড় করে তাঁর বাণী শোনে। সেই সুঁটে সেন ডেকে পাঠিয়েছেন স্বপ্নাশিষকে।

স্বপ্নাশিষ প্রথমে ভেবেছিল যাবে না। কেউ ডেকে পাঠালেই যেতে হবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু সুব্রত তাকে বলল যাওয়ার জন্যে। সি এ বি-তে সুঁটে সেন নেই কিন্তু তাঁর অদৃশ্য হাত কোথায় নেই তাই কেউ বলতে পারে না। জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। অতএব বিকেলবেলা সে হাজির হল কোহিনূরের টেন্টে।

সুঁটে সেন বসেছিলেন চামচে পরিবৃত হয়ে। ওঁদের ক্লাবের বাবুল বোস বেঙ্গলের উইকেট কিপার। সে বিনীত গলায় কিছু বলছিল। সুঁটে বললেন, 'দ্যাখ বাবুল, তুই উইকেট কিপার, উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে বল ধরবি, ব্যাটসম্যান ভুল করলে তবে স্ট্যাম্প ওড়াবি। তুই চেষ্টা করলেও উইকেট নিতে পারবি না, আট নম্বরে নামিস, রানও কুড়ির বেশি করতে পারবি না। দলকে জেতানোর ব্যাপারে তোর যা ভূমিকা অন্য উইকেট কিপারেরও তাই। লিলি, ইমরান, রিচার্ড, শ্যেন, আমাদের শচীন টিমকে জেতাতে পারে। কিন্তু কুন্দরাম, মোরে, মোঙ্গিয়া কি সে সম্মান পায় ? তবু তুই যখন বলছিস আমি দেখি কী করা যায়। তোর ভাইকে পাঠিয়ে দিস, দেখব।'

কথা বলতে বলতেই স্বপ্নাশিষকে দেখেছিলেন তিনি, 'কী চাই ?'

'আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন !'

'আপনার পরিচয় ?'

'আমি স্বপ্নাশিষ !'

সঙ্গে সঙ্গে চামচেদের একজন আগ বাড়িয়ে স্বপ্নাশিষের বিবরণ শুনিয়ে দিল। সুঁটে সেন সোজা হয়ে বসলেন, 'ও ! তুমি আমার টিমকে হারিয়েছ ?'

বলার ভঙ্গিতে স্বপ্নাশিষের মনে হল সে বিশাল অন্যায় করে ফেলেছে ! তার কোনও কৈফিয়ত দেবার নেই। সে চুপ করে রইল।

সুঁটে সেন বললেন, 'কিন্তু মনে রেখো, ক্রিকেট একজনের খেলা নয়। হরিমাধবের টিম ভাল না খেললে তুমি একা কিছুই করতে পারতে না। ভজুকে তুমি ঝুলিয়েছ কেন ?'

'আমি তো কিছু করিনি। উনি যা করতে বলেছিলেন তা খেলোয়াড় হিসেবে আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

'হুম। নেক্সট সিজনে আমার টিমে আসছ ?'

'আমি ভেবে দেখব।'

'ভাবার কী আছে ? টিমে এসো, যতদিন ফর্ম থাকবে বেঙ্গলে জায়গা

পাকা। কলেজে পড়ো তো, টাকা পয়সার প্রমিস করছি না, চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে।'

'আমাকে ভাবতে দিন।'

'ভাববার আছেটা কী ? হরিমাধব তো ক্লাব কোচিং ছেড়ে দিয়েছে। যেন লঙ্কা জয় হয়ে গেছে তাঁর। ফালতু। আমি দেখতে চাই সামনের বছরে ওই শ্যামবাজারের বিরুদ্ধে তুমি সেঞ্চুরি করছ। বুঝতে পেরেছ ?' সুঁটে সেন চোখ ছোট করলেন, 'ইউনিয়নের সন্তোষ টোপ দিয়েছে নাকি ? শুনছি সামনের বছর ওরা ভাল টিম করার চেষ্টা করছে। কি, সন্তোষ গিয়েছিল ?'

'না, ইউনিয়ন থেকে কেউ আসেনি। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। আমি যাই !' স্বপ্নাশিষ আর দাঁড়ায়নি।

কটকে যাওয়ার আগের দিন আহিরের সঙ্গে দেখা হবার কথা ছিল কলেজের পর, কিন্তু আহির এল না। এমনিতে চারপাশের আবহাওয়া বেশ ভাল। সেই মাসি দুদিন থেকে যাওয়ার পর পিতৃদেবের আচরণের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আর কথায় কথায় চেঁচাচ্ছেন না। বেশিরভাগ সময় চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন। বনলতা নামের সেই মেয়েটি কিন্তু কেলোর মায়ের অনুপস্থিতিতে কাজ করতে আসেনি। মাসি তখন একা সামলেছেন। ফিরে এসে কেলোর মা জানিয়েছে বনলতা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পুজো দিয়ে আসার পর কেলো নাকি বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অসহিষ্ণু হয়ে উঠল স্বপ্নাশিষ। কাল ধৌলি এক্সপ্রেসে তাদের কটকে যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগে আহিরের সঙ্গে না দেখা করে যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না। আজ পর্যন্ত কখনও আহির কথা দিয়ে আসেনি এমন হয়নি। বারোটা পর্যন্ত সে চাতকের মত পথ চেয়ে রইল। কফি হাউসের দিকে যে মেয়েই আসছে তাকেই দূর থেকে আহির বলে ভাবতে গিয়ে ঠোক্কর খাচ্ছিল।

শেষপর্যন্ত সেই সময়টা এল যখন কোনও আশা আঁকড়ে থাকা যাচ্ছে না। অনেক রকম ভাবনা ভাবার পর স্বপ্নাশিষ স্থির করল সে শ্যামনগরে যাবে। সোজা শেয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরল সে। এর আগেরবার সঙ্গে সুব্রত ছিল, স্টেশনগুলোকে পেছনে ফেলে ফেলে ট্রেনটা যখন শ্যামনগরে পৌঁছাল তখন স্বপ্নাশিষের বুকের ভেতর দ্রিদিম দ্রিদিম শুরু হয়ে গিয়েছে। কেউ কিছু বলবে না ? সুব্রত প্রায়ই তাকে শুনিয়েছে শ্যামনগরের ছেলেরা এ সব ব্যাপার প্রশ্রয় দেয় না। কথাটা আহিরকে অবশ্য কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

স্টেশন থেকে একটা রিকশা নিয়ে সে চেনা পথ ধরে চলে এল খেলার মাঠের কাছে, এসে রিকশা ছেড়ে দিল। একবার যাওয়া আসা করেই মনে হচ্ছে সব চেনা। দূর থেকে আহিরদের বাড়িটা নজরে এল। ব্যালকনিতে কেউ নেই। তার মনে হল আহির নিশ্চয়ই অসুস্থ। কোনও কারণে সে কলকাতায় যেতে না পারলে স্বপ্নাশিষ যে আসবেই এটা নিশ্চয়ই অনুমান করবে আর তা হলে ওকে ব্যালকনিতে দেখা যেতই। মাঠের পাশ দিয়ে আড়ষ্ট পায়ে এগোচ্ছিল সে। সোজা বাড়িতে গিয়ে ডাকলে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে কে জানে! কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আছে! যদিও এখন ভর দুপুর, কারও বাড়িতে যাওয়ার সময় নয় কিন্তু এসে যখন পড়েছে—।

'আরে! আপনি এখানে?'

গলাটা শুনে মুখ ফেরাতেই দুজন ছেলেকে দেখতে পেল সে। একটা বাড়ির বারান্দায় বসে কথা বলছিল ওরা, এ বার উঠে এল। স্বপ্নাশিষ দাঁড়াল। ছেলে দুটোর একজন বলল, 'কার কাছে এসেছেন?'

একদম সরাসরি প্রশ্ন, কী জবাব দেবে? হঠাৎ বাপীর নাম মনে পড়ে গেল। আর সে নামটাকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরল, 'বাপীদের বাড়িটা কোথায়?'

'কোন বাপী? এ পাড়ায় দুজন বাপী আছে।'

ফাঁপড়ে পড়ল সে। বাপীর উপাধি অথবা ভাল নাম জানতে চাওয়ার প্রয়োজন সে কখনও বোধ করেনি। স্বপ্নাশিষ চেহারার বিবরণ দিতে দ্বিতীয়জন বলল, 'ও, আসুন।' ছেলেদুটো হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো বেঙ্গল টিমে খেলছেন?'

স্বপ্নাশিষের মনে হল এই ব্যাপারটা তার গুরত্ব নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দিয়েছে। সে মাথা নাড়ল।

'বেঙ্গল জোনাল ম্যাচে ভাল খেলে কিন্তু তারপরেই ধেড়ায়।' একজন বলল।

দ্বিতীয়জন বলল, 'আর কোশেন্টে ম্যাচ জেতে।'

'কিন্তু আপনি আর খেলতে এলেন না কেন এখানে?'

'আমাকে কেউ ডাকেনি।'

'বাপীর সঙ্গে আপনার অনেকদিনের আলাপ?'

'না, বেশিদিন নয়।'

ভাগ্য ভাল। বাপী বাড়িতে ছিল। তাকে দেখে সে হৈহৈ করে উঠতেই ছেলে দুটো বিদায় নিল। এখানে কোথায় এসেছে, হঠাৎ তার কাছে কেন এই সব প্রশ্ন প্রায় একসঙ্গে করায় স্বপ্নাশিষের সুবিধে হল।

সে উত্তর দিল ভাসা ভাসা।

বাপীদের বাড়িতে বসে মিষ্টি খেতে হল। তাকে বলতে হল সে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিল। ফেরার পথে মনে হল দেখা করে গেলে কেমন হয় তাই এসেছে। বাপী অনেক কথা বলছিল কিন্তু আহিরের প্রসঙ্গ তুলছিল না। যখন কথা প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে তখন স্বপ্নাশিষ উঠল। বাপী তাকে এগিয়ে দিতে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আহিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না।' মাথা নাড়ল স্বপ্নাশিষ।

'যাবেন ওদের বাড়িতে?'

'এই সময়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'আমার বাড়িতে এসে ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে আহির আমার মাথা ফাটাবে। সত্যি বলুন তো আপনি আমার কাছে এসেছিলেন না অন্য প্ল্যান ছিল?'

'প্ল্যান আবার কিসের! ঠিক আছে, ওদের বাড়িতে গেলেই বোঝা যাবে সেরকম কিছু আছে কি না।'

স্বপ্নাশিষ হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারল হাসিটা জোর করে হাসতে হল।

বেল টিপতেই সুন্দর আওয়াজ হল কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। দ্বিতীয়বার বোতামে চাপ দেবার পর ওপরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পুরুষকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

রাস্তায় নেমে বাপী জবাব দিল ওপরের দিকে তাকিয়ে, 'আমি।'

'কী ব্যাপার?'

'আহিরকে একটু ডেকে দেবেন, বলুন, কলকাতা থেকে স্বপ্নাশিষ এসেছে।'

'কে স্বপ্নাশিষ?'

'ক্রিকেট খেলে। এবার বেঙ্গলের হয়ে খেলবে।'

ওপর থেকে আরকোনও প্রশ্ন ভেসে এল না। বাপী স্বপ্নাশিষের দিকে তাকাল, 'আহিরের বাবা।' সে উঠে এল দরজার সামনে।

একটু বাদেই যিনি দরজা খুললেন তিনি প্রৌঢ়, ফর্সা, মাথায় টাক, 'কী চাই?'

বাপী বলল, 'আহিরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'কেন?'

'ওদের পরিচয় আছে। আমার কাছে এসেছিল, তাই—।'

'এখন দেখা হবে না।'

'ও বাড়িতে নেই ?'

'এত প্রশ্ন কেন করছ ! আমি যখন বলেছি দেখা হবে না তখন সেইটে মেনে নাও।'

'ও তো অনেকদূর থেকে এসেছে— ।'

'কোনও জরুরি কাজ বা কথা বলতে আসেনি তো।'

'আহির কি অসুস্থ ?' স্বপ্নাশিষ প্রথম কথা বলল।

'না না অসুস্থ হবে কেন ? আচ্ছা, এসো।'

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। বাপী স্বপ্নাশিষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে কোনও গোলমেলে কেস আছে। এ বাড়িতে এলে আমি সোজা দোতলায় উঠে যাই, আর আজ আমাকেও ঢুকতে দিল না।'

স্বপ্নাশিষের খুব রাগ হচ্ছিল। বাপী যে গলায় কথা বলেছে তা আহিরের শেখা উচিত অথচ সে নিজে একবারও বেরিয়ে এল না। স্বপ্নাশিষ বলল, 'চলো।'

ওরা মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে শূন্য ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে স্বপ্নাশিষ বলল, 'ওকে বলো, আমি কাল ভোরে কটক চলে যাচ্ছি। এ রকম ব্যবহার না করলেও পারত।'

বাপী বলল, 'আমার মনে হচ্ছে কোনও বড় গোলমাল হয়েছে। আহিরের মতো মেয়ে এ রকম কখনওই করবে না। কী যে হল !'

বাপীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিকশায় বসে স্বপ্নাশিষ আবিষ্কার করল তার মনে আর রাগ নেই, বদলে অদ্ভুত এক হতাশা শূন্যতা তৈরি করেছে। কীরকম ব্যথায় টাটিয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। সে চোখ বন্ধ করল। আহির কি তাকে এড়িয়ে যেতে চাইল ? তা হলে এতদিন আহির তাকে যা যা বলেছে, যে স্বপ্ন দেখিয়েছে তার সবই মিথ্যে ? ক্রমশ বুকের যাবতীয় টনটনানি ওপরে উঠে আসতে লাগল। নিজেকে কী ভীষণ অসহায় লাগছিল তার।

বিছানায় শুয়েছিল সে। কেলোর মা খেতে ডাকতে এলে বলল, 'শরীর ভাল নেই, খাব না।'

একটু বাদেই দেবাশিষ এল, 'কী রে, কী হয়েছে ?'

'এমনি, শরীর খারাপ !'

দেবাশিক কপালে হাত রেখে বলল, 'জ্বর তো নয়। তা হলে ?'

'আমাকে একা থাকতে দে দাদা।'

দেবাশিষ কী বুঝল সেই জানে, বেরিয়ে গেল। খাওয়া শেষ হলে

পিতৃদেব এলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'শরীর যখন খারাপ তখন আর কাল কোথাও যেতে হবে না।'

স্বপ্নাশিষ উঠে বসল, 'কিন্তু কাল তো কটক যেতে হবে।'

'অসুস্থ শরীর নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।'

'আমি ঠিক হয়ে যাব।'

পিতৃদেব আর দাঁড়ালেন না। স্বপ্নাশিষের মনে হল, কটকে না গেলেই ভাল হয়। সে মোটেই ভাল খেলতে পারবে না। আজ দুপুরের ঘটনার পর সে আর মনস্থির করে ব্যাট করতেই পারবে না। তার আর কিছুই ভাল লাগছে না। এই ক্রিকেট-জীবন, বাড়ি, কলেজ সব ছেড়ে যদি অন্য কোথাও চলে যাওয়া যেত।

কটকে ট্রেন পৌঁছেছিল একটু দেরিতে। হোটেলে ঢোকার পর দেখা গেল সেদিন আর প্র্যাকটিসের সময় নেই। ওর রুমমেট বাবুল বোস। ম্যানেজার আর ক্যাপ্টেন উইকেট দেখতে বেরিয়ে গেল বিকেলবেলায়। সঙ্গে সঙ্গে তাসের আসর বসে গেল ওদের ঘরে বাবুল বোসের ব্যবস্থাপনায়। রামি খেলা হচ্ছে পাঁচজনে মিলে। তাসের কিছুই বোঝে না সে। দুটো খাট কাছাকাছি এনে সবাই বসেছে।

বাবুল তাকে বলল, 'বেড়াতে এসেছ, যাও চারপাশে একটু ঘুরে এসো।'

স্বপ্নাশিষ প্রতিবাদ করল, 'বেড়াতে এসেছি মানে ?'

'তা ছাড়া কী !' টি কে রায় বলল, 'প্রতিবছর হয় কটক নয় জামশেদপুর অথবা গৌহাটি ফ্রিতে বেড়াতে যাওয়া এখন বাঁধা। তুমি বোর হচ্ছ বলে বাবুল ওই কথা বলল।'

স্বপ্নাশিষ বেরিয়ে এল। হোটেলের লবিতে যে বসার জায়গা সেখানে বসে মানুষের যাতায়াত দেখতে লাগল। ওড়িশার কিছু প্লেয়ার এসেছে দেখা করতে। একসঙ্গে রঞ্জি এবং ইস্টার্ন জোনে খেলে দুই রাজ্যের প্লেয়ারদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে। জীবনে এই প্রথমবার বাড়ির বাইরে সে যেখানে পিতৃদেবের কোনও শাসন নেই। জীবনে প্রথমবার এতবড় হোটেলে সে থাকছে। বাবুল বোস বলছিল বোম্বেতে খেলতে গেলে এর চেয়ে অনেক বড় হোটেলে থাকার সুযোগ হয়। স্বপ্নাশিষের হঠাৎই আহিরের কথা মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু তেতো হয়ে উঠল। আহির, তুমি আমার সঙ্গে অমন করলে কেন ?

...'তোমার কোনও মেয়ে বন্ধু নেই, না ?'

'না।'

'অল্প বয়সের কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপও নেই ?'
'না।'
'মেয়েদের সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হত না ?'
'সত্যি কথা বললে হত, কিন্তু সাহস পেতাম না।'
'কেন ?'
'তেমন কাউকে দেখিনি যার কাছে সাহস করে এগিয়ে যাওয়া যায়।'
'তা হলে আমার জন্যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন ?'
তবু, আহির, সব জেনেও তুমি আমার সঙ্গে এমন করলে কেন ?

সকালে মাঠে গিয়ে স্বপ্নাশিষ জানতে পারল প্রথম এগারোজনে তার নাম নেই। সে দ্বাদশব্যক্তি। জল নিয়ে যাওয়া আর কারও বদলে ফিল্ডিং করাই তার কাজ হবে। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল স্বপ্নাশিষ। এটা সে মোটেই ভাবতে পারেনি।

দল মাঠে নেমে যাওয়ার সময় বাবুল বোস বলে গেল, 'হেসে খেলে কাটিয়ে দাও, দুদিন বই তো নয়।' কাটা ঘায়ে নুনের মতো অনুভূতি হল। গতরাত্রে বাবুল তাকে বলেছিল বেড়াতে আসার কথা। অর্থাৎ ও জানত সে দলে থাকছে না। এ অবস্থায় তার কী করা উচিত ? যারা তার বদলে ইনিংস শুরু করবে তাদের গত বছরের পারফরমেন্স যথেষ্ট খারাপ। তবু তাকে বাদ দেওয়া হল। স্বপ্নাশিষ নিজেকে বোঝাতে চাইল, এই ম্যাচই জীবনের শেষ ম্যাচ নয়। যারা আজ আমাকে বাদ দিল তারা কাল গ্রহণ করতে বাধ্য হবেই। পৃথিবীতে ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন ঘটনা আজই প্রথম ঘটল না।

বাংলা জিতল। যদিও প্রথম তিনটে উইকেট পড়ে গিয়েছিল মাত্র বাইশ রানে কিন্তু ওড়িশা প্রথম ইনিংসে একশ আশিও করতে পারল না। কটক থেকে বাংলা বেশি পয়েন্ট নিয়ে ফিরল। এরমধ্যে একজন সাংবাদিক ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওপেনার হিসেবে দলে স্বপ্নাশিষ থাকা সত্ত্বেও তাকে কেন খেলানো হয়নি ? ম্যানেজার বলেছেন, 'প্রথমবার দলে এসেছে, ম্যাচ টেম্পারমেন্ট নেই, ধাতস্থ হবার জন্যে ওকে দ্বাদশব্যক্তি করা হয়েছে। মাঠে যাওয়া আসা করতে করতে নার্ভ পেয়ে যাবে।' বাবুল বোস তাকে সাবধান করে দিয়েছিল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে, তাই তাকে যখন সাংবাদিকটি প্রশ্ন করছিল সে মুখ খোলেনি।

হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা বাড়িতে ফিরতেই সে পিতৃদেবের মুখোমুখি হল।

'কেমন বেড়ানো হল ?'

'আমি বেড়াতে যাইনি।'

'কই, খেলেছ বলে তো কাগজে কোনও খবর বের হয়নি।'

'আমি টুয়েলফথ্ ম্যান ছিলাম।'

'এই পোস্টটা মন্দ নয়। শোনো, ভজুবাবু এসেছিলেন। তুমি যেদিন যাও সেদিন সকালেই এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই জানলাম তুমি খেলছ না যদিও তখনও তুমি কটকে পৌঁছাওনি। অতএব বুঝতে পারছ তুমি যত বড় প্লেয়ারই নিজেকে ভাবো না কেন পেছনে যারা আছে তারা না চাইলে কোনওদিন সুযোগ পাবে না।'

'উনি কেন এসেছিলেন ?'

'তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

নিজের ঘরে চলে এল সে। ভজুবাবু মানে সুঁটে সেন। তার মানে সুঁটে সেনই তাকে খেলতে দেয়নি। আর বাবুল বোস যেহেতু কোহিনূরে খেলে তাই খবরটা আগেই জানত। মনে মনে প্রচণ্ড খেপে গেল সে। কিছুতেই সুঁটে সেনের কাছে মাথা নামাবে না সে। তাতে যদি কোনওদিন বেঙ্গল টিমে জায়গা না হয় না হোক।

বিকেল হতেই সে দেশবন্ধু পার্কে ছুটল। হরিমাধবদা দশ বছরের নীচের বাচ্চাদের নিয়ে প্র্যাকটিস করছেন। ওকে দেখে হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বললেন। চারপাশে বেশ ভিড়। মাঠের বাইরে যে পাকা রাস্তাটা পাক খেয়ে আছে সেখানে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে। বিকেলের পরই দেশবন্ধু পার্ক প্রেম করার জায়গা হয়ে যায়। এ রকম এক জোড়াকে দেখা মাত্র আহিরের কথা মনে এল। আহির নিশ্চয়ই খবরের কাগজ দেখেছে এবং জানে সে কটকে খেলার সুযোগ পায়নি। তারপরেও আহির চুপ করে আছে ? মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয় ?

'আজ ফিরলি ?' হরিমাধবদা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁ।'

'ভেঙে পড়েছিস ?'

'না। কিন্তু এ সব আমার ভাল লাগছে না।'

'ওরা তোকে কিছু বলেছে ?'

'না। তবে অনেকেই যাওয়ার সময় জানত আমাকে খেলানো হবে না। সুঁটে সেন ভজুবাবুকে বাড়িতে পাঠিয়ে খবরটা বাবাকে দিয়েছিল আমরা হাওড়া থেকে রওনা হবার পর। উনি চান আমি ওঁর টিমে খেলি। যতক্ষণ না রাজি হচ্ছি ততক্ষণ আমার পেছনে লাগবেন উনি। কিন্তু এই ঘটনার পর আর আমি কোহিনূরে খেলব না।'

'শ্যামবাজারে থাকবি ?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে তোর কী লাভ হবে। সামনের বছর আশীষ কোচ করবে। কিন্তু শ্যামবাজার তোকে কিছু দিতে পারবে না। এর মধ্যে কানে আসছে কয়েকজন প্লেয়ার বেরিয়ে যাচ্ছে, এদের মধ্যে সুব্রতও আছে। এটা তোর খুব গুরত্বপূর্ণ বছর। চট করে কিছু করে বসিস না।'

'আমি তাই বলে অন্যায়কে মেনে নেব ?'

'না। জীবনে আমিও তা কখনও করিনি। সেটা জীবনে একদম বিফল হয় না। দাঁড়া, আমি একটু ভাবি। তুই ইউনিয়নে যাবি ?'

'ইউনিয়ন ?'

'হ্যাঁ, সন্তোষ বাজপেয়ির দল। এ বার সুঁটে একমাত্র ওদের ভয় পাচ্ছে। আমার সঙ্গে সন্তোষের আলাপ আছে। তুই রাজি থাকলে আমি কথা বলতে পারি।'

'কিন্তু খামোকা আমি দলবদল করব কেন ?'

'যুদ্ধ করতে হলে শুধু সমরবিদ্যা জানা থাকলেই চলে না, ভাল অস্ত্রও দরকার হয়। এখন শ্যামবাজারে তুই সেটা পাবি না। সন্তোষের সি এ বি-তে ভয়েস আছে। সুঁটে সেন যে লাঠি ঘোরায় তা একমাত্র সন্তোষের এলাকা বাদ দিয়ে। নাথিং ইজ রঙ ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। এটা তোর কাছে যুদ্ধ। 'স্বপ্ন, আমি যে ভুল করে ক্রিকেট খেলা থেকে আউট হয়ে গিয়েছিলাম সেই একই ভুল তুই করিস না। শঠতার সঙ্গে লড়াই করতে হলে শঠকের সাহায্য নিতে হয়।'

হরিমাধবদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাঠ পেরিয়ে আসার সময় কথাটা মনে মনে সে আওড়াচ্ছিল, 'নাথিং ইজ রঙ ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার।' ভালবাসা এবং যুদ্ধ কোনও পথ অন্যায় নয়। এই যে কাজটা আহির করল সেটাও কি তা হলে অন্যায় নয়।

'আরে ! উঃ, শেষপর্যন্ত দেখা পেলাম।'

স্বপ্নাশিষ অবাক হয়ে দেখল বাপী তার সামনে দাঁড়িয়ে।

'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি আজ এসেছেন এবং বেরিয়েছেন। সেখান থেকে এখানে আসছি যদি ক্লাবে থাকেন।'

'কী ব্যাপার ?'

'ব্যাপার গুরুতর। এই নিন।'

একটা খাম পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিল বাপী। দিয়ে বলল, 'বাড়িতে একদম বন্দি হয়ে আছে। ওদের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে তার হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে দেবার জন্যে। পড়ে বলুন

কিছু বলতে হবে কি না !'

উত্তেজনায় খাম ছিঁড়তে সময় লাগল। সাদা কাগজে মুক্তোর মতো অক্ষরগুলো পাশাপাশি শুয়ে আছে। 'স্বপ্ন, জানি এ চিঠি পেয়ে বিব্রত হবে। কখন কেমন করে যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি বুঝিনি, বুঝলাম যেদিন তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেও ফিরে গেলে। তারপর থেকে অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে কুরে খাচ্ছে। বাবা আমার বিয়ে দিতে চান। ইচ্ছেটা আগেও ছিল কিন্তু ইদানীং প্রবল হয়েছে তোমার আমার মেলামেশার খবর পেয়ে। যেদিন তোমরা এলে সেদিনই পাত্রপক্ষের আসার কথা ছিল। কিন্তু আমি (স্বেচ্ছায়) ঘরবন্দি (গৃহবন্দি বাবার আদেশে) বলে সেটি আরও দশদিন পিছিয়েছে। আমি এটা মেনে নিতে পারব না। আমি তোমার কাছে যেতে চাই যে কোনও উপায়ে। তুমি কি আমার সঙ্গে বাকি জীবন থাকবে ? যদি রাজি থাকো তা হলে বাপীকে জানিয়ে দাও। যদি না ইচ্ছে হয় তা হলেও জানাতে দ্বিধা করো না। আহির।'

দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়ল সে। তারপর বাপীর দিকে তাকাল।

বাপী গম্ভীরমুখে বলল, 'বলুন।'

'আমি রাজি। রাজি। কিন্তু কী ভাবে দেখা হবে ?'

'আমার সঙ্গে তো ওর কথা হয়নি। আগে ফিরে গিয়ে কথাটা জানিয়ে দিই।'

বাপী চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে এসে ওর হাত ধরে ঝাঁকাল, 'অভিনন্দন।' তারপর দ্রুত চলে গেল স্টেশনের বাস ধরতে। শেষ বিকেলের মাঠে স্বপ্নাশিষ একা দাঁড়িয়ে রইল।

সামনে যুদ্ধ। কিন্তু কী করে সেই যুদ্ধ জয় করা যায় তার কায়দাটা তার জানা নেই। স্বপ্নাশিষের ইচ্ছে করছিল এখনই শ্যামনগরের সেই বাড়িতে গিয়ে আহিরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আহির যে তাকে এত ভালবাসে, এ তো সে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। কিন্তু উদ্ধার করে এনে কোথায় রাখবে সে আহিরকে ? তার নিজস্ব টাকা পয়সা নেই। এ বাড়িতে তোলার কথা ভাবতেই পিতৃদেবের মুখ মনে পড়লে। অসম্ভব। তাকে জুতোপেটা করে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।

কিন্তু সমাধান তো একটা চাই। না, তাকে টাকা রোজগার করতে হবে। মনে পড়ল ভজুবাবুরা দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল। দশ হাজার তো অনেক টাকা। তা হলে ? সুঁটে সেনের কাছে গিয়ে সে কি এখন টাকাটা চাইবে ? ছ্যাঁকা লাগল মনে। তার মানে তো আত্মসমর্পণ করা। হরিমাধবদার কাছে তো বটেই, নিজের কাছে সারাজীবন ছোট

হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা, হরিমাধবদাকে বললে হয় না ? উনি নিশ্চয়ই একটা বিহিত করতে পারবেন। না, হরিমাধবদা নিজেই বিয়ে করেননি, এ সব ব্যাপারের মর্ম বুঝতেই পারবেন না। ছটফট করছিল সে। চিঠিটা আবার সে পড়ল। পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবে তা আহির জানায়নি। শুধু তার বক্তব্য জানতে চেয়েছে।

ঘরের দরজায় শব্দ হতে চমকে তাকাল স্বপ্নাশিষ। কেলোর মা এসে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় কেলোর মা বলল, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?'

'বলো।'

'কালীঘাটের বিয়ে কি আইন মানে ?'

'কালীঘাটের বিয়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ কী হল ?'

'না, কিছু হয়নি। বনলতার বিয়ে হয়েছিল কালীঘাটে মালাবদল করে। কেউ কেউ বলছে স্বামী থাকতে আর বিয়ে করতে পারে না। কেউ বলছে কালীঘাটের বিয়ে বিয়েই না। তাই বলছি।'

'কেন ? বনলতা কি আবার বিয়ে করবে ?'

'হ্যাঁ। আমার ইচ্ছে কেলোর সঙ্গে ওর বিয়ে হোক। ভাল মানাবে।'

'সেকী ? একটা বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের সঙ্গে কেলোর বিয়ে দেবে তুমি ?'

'তাতে কী ? মেয়েটা তো ভাল। অমন ভাল মেয়ে কি আমি পাব। তা যদি বলো আমার কেলোও তো ধোওয়া তুলসিপাতা নয়।'

'কেলো রাজি হয়েছে ?'

'মুখে বলছে না, কিন্তু আমি বুঝতে পারি। তুমি একটা খোঁজ নাও তো !' কেলোর মা চলে গেল। স্বপ্নাশিষ ফাঁপড়ে পড়ল। কালীঘাটের বিয়ের কথা সে অনেক শুনেছে। সাধারণত বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অথবা গরিব মানুষেরা ওখানে বিয়ে করে। সেটা আইনসিদ্ধ কি না তা নিয়ে কখনও ভাবেনি। হঠাৎ মনে হল, সে আর আহির যদি কালীঘাটে গিয়ে মালা বদল করে তা হলে সেটা কী বেআইনি হবে ? সে সবাইকে বলতে পারবে আহির আমার বউ ! একটা কিছু করা দরকার। দাদাকে ডেকে বলবে ব্যাপারটা ? সে সোজা দেবাশিষের ঘরে চলে এল। বিছানায় শুয়ে দেবাশিষ তখন ডাক্তারি বই পড়ছে। স্বপ্নাশিষ গম্ভীর গলায় বলল, 'দাদা, তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'বল।'

'বলছি। কিন্তু তোকে প্রমিজ করতে হবে আপত্তি থাকলে বাবাকে ব্যাপারটা বলবি না।'

'বাবাকে বলব না ? জিজ্ঞাসা করলেও নয় ?'

'না। তুই কিছু শুনিসনি এটাই বলবি !'

'সেটা কি ঠিক হবে ? আচ্ছা, বল।'

'দেখ দাদা, আমি একটা মেয়েকে খুব ভালবাসি। সে-ও আমাকে। কিন্তু তার বাবা রাবণের মতো তাকে আটকে রেখেছে। যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমাদের প্রেম ধ্বংস করে দিতে চাইছে।'

'সেকী ! স্বপ্ন ? তুই এ সব করেছিস ?'

'হ্যাঁ। করেছি।'

'তুই করতে পারলি ?'

'আমি ইচ্ছে করে করিনি। হয়ে গেছে প্রাকৃতিক নিয়মে। যেমন করে রাত দূর হয়ে সকাল আসে, যেমন করে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, তেমনি।'

'ছি ছি ছি। বাবা শুনলে কী বলবে ?'

'বাবা হনুমানের মতো সূর্যকে বেশিদিন বগলদাবা করে রাখতে পারেন না !'

'তুই বাবাকে হনুমান বললি ?' শিউরে উঠল দেবাশিষ।

'বাবাকে বলিনি, উপমাটা দিয়েছি। তুই আমাকে হেল্প করবি ?'

'আমি ?'

'হ্যাঁ। ওকে উদ্ধার করে বিয়ে করতে চাই আমি।'

'অ্যাঁ ? সেকী ? তুই বিয়ে করবি ? বাবার কথা মনে নেই তোর ? অসম্ভব। স্বপ্ন, তুই এ সব চিন্তা ছেড়ে দে। মেয়েদের সঙ্গে মিশলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'তোর মাথা !'

'তুই ব্রহ্মচারী থাকবি না ?'

'না।'

'বাবা তোকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। আমি বললেও শুনবে না।'

'দিক বের করে। আমি গাছতলায় থাকব সেও ভি আচ্ছা !'

'না। আমি তোকে সাহায্য করতে পারব না।' দেবাশিষ মাথা নাড়ল।

পরদিন প্র্যাকটিসে কেটে গেল। বাংলা দল অসমের সঙ্গে খেলবে

ইডেনে। প্রথম চৌদ্দজনে স্বপ্নাশিষ রয়েছে। প্র্যাকটিসের শেষে ভজুবাবু এলেন, 'কি ভেবেছ ?'

'এখনও ভাবিনি।'

'নিজের কবর খুঁড়ো না হে। সুঁটেদা বেশিদিন ধৈর্য রাখতে পারেন না।'

জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিল স্বপ্নাশিষ। তার টাকার দরকার। ভবিষ্যতে কী করতে হবে কেউ জানে না। মিছিমিছি শত্রু বাড়িয়ে লাভ নেই।

মাঠ থেকে বেরিয়ে ট্রাম ধরবে বলে এগোচ্ছিল এমন সময় একজন এসে বলল, 'একটু আসবেন !'

লোকটা দূরে দাঁড়ানো একটা অ্যাম্বাসাডার দেখাল। আজকাল বয়স্করাও তাকে আপনি বলে সম্বোধন করে। স্বপ্নাশিষ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'সন্তোষদা আছেন গাড়িতে। সন্তোষ বাজপেয়ী।'

আজকাল কথায় কথায় এত অবাক হতে হচ্ছে যে স্বপ্নাশিষ অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তার জন্যে সন্তোষ বাজপেয়ী এখানে অপেক্ষা করছে মানে হরিমাধবদার সঙ্গে কথা হয়েছে।

গাড়িতে উঠে বসতেই সন্তোষবাবু বললেন, 'হরিদা কাল সকালে দেশবন্ধু পার্কে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি অপেক্ষা করার মানুষ নই। শুনেছিলাম সুঁটে সেন তোমাকে তুলে নিয়েছে তাই আমি তোমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করিনি। যা হোক, সামনের সিজনে স্পোর্টিং-এ খেলবে ?'

'আমার আপত্তি নেই, কিন্তু—।'

'বলে ফেলো।'

'সুঁটে সেন কটকে আমাকে খেলতে দেননি।'

'জানি। ইডেনে তুমি খেলবে। আর কিছু ?'

'আমার একটা চাকরি দরকার।'

সন্তোষ বাজপেয়ী পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে স্বপ্নাশিষের হাতে দিল, 'কাল বিকেল তিনটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করো।'

'কাল তো প্র্যাকটিস আছে।'

'না। দুটোর পর থাকবে না।' সন্তোষবাবু হাসলেন, 'কোথায় যাবে ?'

'আমি নেমে যাচ্ছি। কোনও অসুবিধে হবে না।'

ট্রামে বসে মনে হচ্ছিল সে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে একসঙ্গে। সে যদি চাকরি পায় তা হলে পিতৃদেব

তাড়িয়ে দিলেও কোনও পরোয়া নেই। সুঁটে সেন যতই বিপক্ষে যাক সন্তোষ বাজপেয়ী তো বলল সে খেলতে পারবে। হঠাৎ এক ধরনের বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হল সে। কেন তাকে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দু দলের মাঝখানে পড়তে হচ্ছে। কেন সে স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যেতে পারছে না!

ট্রাম থেকে নেমে স্বপ্নাশিষ ভূত অথবা দেবতা দেখল। বাপী দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতে এবং তার পাশে আহির। গলির মুখেই অপেক্ষা করছে ওরা। আহিরকে কি রকম বিমর্ষ দেখাচ্ছে। সে দ্রুত ছুটে গেল কাছে, 'তোমরা?'

বাপী বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে। তিনঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।'

'ও।' স্বপ্নাশিষ ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে, কোথায় নিয়ে গিয়ে বসাবে ওদের।

আহির বলল, 'আমি চলে এলাম।'

'ভাল করেছ।'

বাপী বলল, 'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি মাঠে গিয়েছেন। দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে খুঁজে পাইনি। তারপর থেকে দাঁড়িয়ে আছি এখানে।'

'আজ ইডেনে প্র্যাকটিস ছিল। এসো।' স্বপ্নাশিষের মনে পড়ল রেস্টুরেন্টটার কথা। পাড়ার ছোট রেস্টুরেন্ট। চেয়ারে ছারপোকা আছে, থাকগে।

বসেই বাপী বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়ান। সেদিন শেয়ালদায় বলেছিলাম আর একদিন আপনাকে বধ করব। আজ সেদিন।'

আহির চাপা গলায় বলল, 'বাপী—!'

'চুপ কর। হেভি রিস্ক নিয়েছি, যে কোনও মুহূর্তে পুলিশ আমাকে ধরতে পারে।'

'সেকী! কেন?'

'আহির তো পালিয়ে এসেছে। ট্রেনে না এসে শ্যামনগর থেকে অটোয় ব্যারাকপুরে, সেখান থেকে বাসে এখানে। ওই ব্যাগে কয়েকটা শাড়ি জামা ছাড়া কিছুই আনতে পারেনি। ওর বাবা এতক্ষণে পুলিশে খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই।'

আহির বলল, 'আমি বলছি বাবা সেটা করবে না। ওঁর প্রেস্টিজ যাবে এমন কাজ কখনও করতে পারেন না। এতক্ষণে আমাকে মৃত ডিক্লেয়ার

করে বসে আছেন।'

খাবারের অর্ডার দিল স্বপ্নাশিষ। পকেটে যা আছে তাতে টেনেটুনে হয়ে যাবে।

আহির বলল, 'আমি তোমার ওপর চাপ তৈরি করলাম। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

বাপী বলল, 'শুনুন। আমার এক দিদি থাকে গোয়াবাগানে। আহির আজ ওখানে থাকবে। কিন্তু কাল আপনারা বিয়ে করে নিন।'

আহির জিজ্ঞাসা করল, 'একদিনে সেটা সম্ভব?'

'তা হলে টাইম দিয়ে বেরিয়ে এলি না কেন?'

'বললাম তো, কাল সকালে পাকা দেখা ছিল।'

স্বপ্নাশিষ বলল, 'কালীঘাটে গিয়ে—।'

'কালীঘাট?' আহির আঁতকে উঠল।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, 'কোনও এক্সপেরিয়েন্স আছে?'

'না না। শুনেছি ওখানে ও সব হয়।'

'ঠিক আছে।' বাপী বলল, 'দিদিকে গিয়ে বলি। ও তো প্রেম করে বিয়ে করেছিল, লাইন জানে। কিন্তু কাল বিয়ের পর ওকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। এটা ওর সম্মানের জন্যে।'

'কালই? মানে আমি কাল বিকেলে চাকরির জন্যে যাব। হয় তো সামনের মাস থেকে চাকরি পাব। ততদিন অপেক্ষা করা যায় না?'

'না যায় না। আমার দিদি অতদিন ওকে রাখবে কেন আর ওই বা ওখানে থাকবে কোন ভিত্তিতে? আপনার বাবাকে ম্যানেজ করুন।'

খাওয়া শেষ করে ওরা গোয়াবাগানে এল। বাপীর দিদির বাড়ি দেখে চলে এল স্বপ্নাশিষ। আসবার সময় আহির হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খুশি?'

'খুব।'

'সত্যি বলছ? আমি তোমাকে বিপদে ফেললাম না তো?'

'বিপদ তো আমার একার নয়, তোমারও।' স্বপ্নাশিষ পূর্ণ বিশ্বাসে বলেছিল।

বাড়িতে ফিরে এসে স্বপ্নাশিষ দেখল আবহাওয়া খুব ভাল। মাসি এসেছেন, পিতৃদেব বেশ তরল গলায় তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে দেখতে পেয়ে পিতৃদেব গম্ভীর হলেন, 'কোথায় থাকো? পড়াশুনা তো ডকে তুলেছ। যাকগে, হরিমাধব এসেছিল। সে তোমাকে দেখা করতে বলেছে।'

'আচ্ছা।'

মাসি বললেন, 'আচ্ছা, আপনি ওকে দেখামাত্র খেঁকিয়ে কথা বলেন কেন বলুন তো !'

পিতৃদেব জবাব দিলেন না, সে ভেতরে চলে গেল। দেবাশিষ তখনও বাড়ি ফেরেনি। হাসপাতালে ডিউটি থাকলে ওর সাতখুন মাপ। চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল স্বপ্নাশিষ। কী করা যায় মাথায় ঢুকছিল না। কাল তাকে বিয়ে করতে হবে, কিন্তু কী ভাবে ?

'কেমন আছ ?' দরজায় শব্দ হল।

'ভাল না।' মুখ থেকে সঠিক উত্তর বেরিয়ে এল।

'কেন ? কী হয়েছে ?' মাসি পাশে এসে দাঁড়াল।

কথা না বলে মাথা নাড়ল সে। তার খেয়াল হল, এর বেশি বলা ঠিক হবে না।

'বাবার কথায় মেজাজ খারাপ হয়েছে ?'

'দূর ! ওতে তো আমরা অভ্যস্ত। গায়েই মাখি না।'

'তা হলে ? আমাকে খুলে বলতে পারো। নিজের মা থাকলে কি তাকে বলতে না ?'

হঠাৎ এত বছর পরে স্বপ্নাশিষ সেই মহিলার অভাব বোধ করল। শৈশবে প্রতিটি বন্ধুর মাকে দেখে একধরনের কষ্ট হত কিন্তু সেটা নিয়ে বেশি ভাবার সুযোগ হয়নি। আজ মনে হল সেই ভদ্রমহিলা যদি থাকতেন তা হলে তার সমস্যার সমাধান না হোক সাহায্যে এগিয়ে আসতেন।

'আপনি আমার মা নন, আপনাকে বলে লাভ কী !'

'লোকে তো দুধের সাধ ঘোলেও মেটায়, তাই না ?'

স্বপ্নাশিষ মহিলার দিকে তাকাল। না, মোটেই ভিলেনের মতো দেখতে নয়। কিন্তু এই বয়সে তাদের বাড়িতে প্রায়শ আসাযাওয়াও খুব স্বাভাবিক নয়। একে সে যা বলবে তা পিতৃদেবের কানে পৌঁছে যাবে। অবশ্য সেটা একটা ভাল ব্যাপার, তাকে নিজের মুখে বলতে হবে না। পিতৃদেবকে বলার ব্যাপারটা আজ না হোক, কাল তো অবশ্যই আসবে।

স্বপ্নাশিষ বলল, 'আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি।'

বলার সময় সে সোজা হয়ে বসল। মুখচোখ শক্ত। যেন কোনওরকম অন্যায় করছে না।

'বেশ তো। মেয়েটি কী করে ?'

'কলেজে পড়ে। ওর বাবা জোর করে বিয়ে দিতে চাইছে।'

'তাই ? সে-ও মেনে নিয়েছে ?'

'মোটেই না। প্রতিবাদ করেছে, বোঝাতে চেষ্টা করেছে, শেষপর্যন্ত না

পেরে বাড়ি থেকে না বলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।'

'সেকী ? কোথায় আছে সে ?'

'ওর বন্ধুর দিদির বাড়িতে। কিন্তু সেখানে একদিনের বেশি থাকা যাবে না। কী যে করি ! ও চাইছে কালকেই আমরা বিয়ে করে ফেলি। একবার বিয়ে করে ফেললে ওর বাবা আর কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু কালকেই কী ভাবে বিয়ে করা যায় তাই তো আমি জানি না। তারপর বিয়ে যদি হয়েও যায় ওকে কোথায় আনব ? সামনের মাস থেকে আমি চাকরি পাচ্ছি। দিনের বদলে রাতের কলেজে ভর্তি হব। তারপর মাইনে পেলে না হয় বাড়ি ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। তদ্দিন কোথায় থাকবে ও ?'

মাসি গম্ভীর মুখে শুনছিলেন, বললেন, 'কেন ? এই বাড়িতে।'

'আপনি আমার বাবাকে চেনেন না !'

'তা অবশ্য। এক কাজ করো, তোমরা দিল্লি চলে যাও।'

'দিল্লি ?'

'হ্যাঁ। ওখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'অসম্ভব। আমার ক্রিকেট-জীবন শেষ হয়ে যাবে।'

'ও। মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও। ও আমার কাছে থাকবে। যতদিন না তুমি চাকরি পাচ্ছ, বাড়ি ভাড়া করছ ততদিন থাকবে। আর এর মধ্যে নোটিস দিয়ে তুমি বিয়েটা রেজেস্ট্রি করে ফেল। ওর বয়স কত ?'

'জানি না। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজে পড়ছে।'

'তা হলে তো আঠারো পেরিয়ে গেছে।' স্বপ্নাশিষের মনে হল সে যেন শেষপর্যন্ত সবুজ দ্বীপ দেখতে পাচ্ছে। ভদ্রমহিলা এতটা সাহায্য করবেন সে ভাবতেও পারেনি।

'তা হলে কখন আলাপ করাবে ?'

'বাবা জানলে কিন্তু আপনার ওপর খুব রেগে যাবে।'

'ওঁকে এখনই কিছু বলার দরকার নেই।'

'ঠিক আছে। আহির গোয়াবাগানে আছে। কাল সকালে আমাদের দেখা হবে।'

'ও আজই আমার সঙ্গে যেতে পারে না ?'

'আজ ?'

'ঠিক আছে। তুমি বরং কালই ওকে আমার ওখানে নিয়ে এসো। আমার ঠিকানাটা জানো। জানো না, লিখে নাও।'

মাসিকে সে প্রথম থেকেই ভালভাবে নিতে পারেনি। মনে হত ভদ্রমহিলা কোনও মতলব নিয়ে এ বাড়িতে আসাযাওয়া করছেন। কিন্তু এখন ওঁকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছিল। সকালে দেখা হতেই আহিরকে সব কথা খুলে বলেছে সে। আহিরের মুখ চোখ বেশ ফোলা। কাল রাত্রে খুব কেঁদেছে বোঝাই যাচ্ছে। সেই কান্না যে নিজের বাড়ির জন্যে তা বুঝতে অসুবিধে হবার নয়। স্বপ্নাশিষ বলল, 'তুমি কি শ্যামনগরে ফিরে যাবে ?'

'না।'

'ভেবে দেখো। তোমার যদি খুব মন খারাপ হয়—।'

'হলেও কিছু করার নেই। তোমার নিজের মাসি ?'

ঠিক নিজের নয় তবে মায়ের সম্পর্কিত বোন। এতদিন দিল্লিতে থাকতেন। এখন কলকাতায় চলে এসেছেন। তুমি চলো, তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

আহির আপত্তি করেনি। কারণ তার আপত্তি জানানোর কোনও উপায় ছিল না।

দক্ষিণ কলকাতায় মাসির বাড়িতে যাওয়ামাত্র তিনি যেভাবে আহিরকে জড়িয়ে ধরলেন সে ভাবেই সম্ভবত স্বপ্নাশিষের মা আহিরকে গ্রহণ করতেন। আহিরের হাত ধরে তিনি বললেন, 'বাঃ, কী সুন্দর মেয়ে। এসো, এসো। দেখো, দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হঠাৎ আহির কেঁদে ফেলল। যে আহিরকে আগে দেখেছে সে যে এ ভাবে কাঁদবে তা ভাবতে পারেনি স্বপ্নাশিষ। মেয়েরা কী দ্রুত বদলে যায় ! মাসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, 'কে বেশি আপত্তি করেছে, বাবা না মা ?'

'দুজনেই।'

ঠিক করেছেন।'

আহির মুখ তুলে মাসির দিকে তাকাল।

'আচ্ছা বল তো, তোর মেয়ে যদি কলেজে পড়ে আর ক্রিকেট খেলে বেড়ায় এমন একটা ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করতে চায়, তুই রাজি হতিস ?'

'আমি তো এখনই বিয়ে করতে চাইনি।'

'ও। কিন্তু ভবিষ্যতে তো করবি অথচ ছেলেটা ভাল রোজগার করবে কি না তা জানিস না। তোর বাবা মা কোন ভরসায় অপেক্ষা করবেন ?'

'বাঃ, আমিও তো চাকরি করব।'

'এখন তুই বুঝবি না। সব বাবা-মা-ই সন্তানকে নিরাপদে রাখতে

চায়। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। তুই এখন এখানেই থাক আর ওঁদের একটা চিঠি লেখ যাতে চিন্তা না করে, তুই জলে পড়ে নেই।'

'এখানকার ঠিকানা জানিয়ে দেবে ?' আঁতকে উঠল স্বপ্নাশিষ।

'ঠিকানা জানাতে না চাইলে জানাবি না, খবরটা তো দিবি। মনে রাখিস ওঁরা তোদের শত্রু নন। আয়, এই ঘর তোর। নিজের মতো থাকবি। আমি তো এখনই ভাল করে গুছিয়ে বসিনি। বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না বলে এ দিক ও দিকে বেরিয়ে পড়ি। তোরা বোস, আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।' মাসি বেরিয়ে গেলেন।

নির্জন ঘরে আহিরের সঙ্গে কখনও থাকেনি স্বপ্নাশিষ। আহির মাথা নিচু করে বসে আছে। স্বপ্নাশিষ বলল, 'তোমাকে ওঁর পছন্দ হয়েছে।'

'কী করে বুঝলে ?'

'ওই যে একবারেই তুইতে নেমে গেলেন।'

আহির ম্লান হাসল। স্বপ্নাশিষ বলল, 'সামনের বছর যে ক্লাবে যাব তাদের প্রেসিডেন্ট আজ বিকেলে আমাকে দেখা করতে বলেছেন। চাকরি দেবেন।'

'পড়াশুনা ?'

'ইভনিং কলেজে পড়ব।' স্বপ্নাশিষ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'তোমার পক্ষে এখান থেকে কলেজ করা বেশ কষ্টকর হবে।'

'আমি কি এখানে অনেকদিন থাকব ?' আঁতকে উঠল আহির।

'না না। বেশিদিন নয়।'

'তা হলে অসুবিধে হবে না।'

স্বপ্নাশিষ আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় এখন সেটা সম্ভব নয়। আহিরও চুপ করে আছে। শেষপর্যন্ত স্বপ্নাশিষ বলল, 'কি রকম দ্রুত সব হয়ে গেল !'

'হ্যাঁ। আমিও ভাবিনি।' আহির চোখ তুলল।

'ঠিক আছে, কোঈ পরোয়া নেই।'

আহির ওর দিকে তাকাল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আই লাভ ইউ স্বপ্ন !'

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা টলে উঠল। ঈশ্বর যেন স্বর্গের চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যা ইচ্ছে তাই করো। সে কী করবে ?

সন্তোষ বাজপেয়ি তাঁর ডালহৌসির অফিসে চাকরিটা দিলেন। এখন টেম্পোরারি। যেদিন খেলা থাকবে সেদিন অফিসে আসতে হবে না। বছর দুয়েক আগে যে সিগারেট কোম্পানি সন্তোষবাবু কিনেছেন তার

ডিলার্স সেলে চাকরি করতে হবে ওকে। ডিলার্সদের কমপ্লেনগুলো নোট করে সঠিক ডিপার্টমেন্টে পাঠাতে হবে। মাইনে বাইশশো টাকা। সেইসঙ্গে তাকে কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করতে হল। আগামী বছর স্পোর্টিং-এ খেলতে সে বাধ্য থাকবে।

বাইশশো টাকা। রাস্তায় নেমে লাফাতে ইচ্ছে করছিল স্বপ্নাশিষের। লাফালেই যেন সে আকাশের নাগাল পেয়ে যাবে এখন। আর তার কোনও চিন্তা নেই। বাইশশো টাকার একটা মাথা গোঁজার জায়গা আর দু বেলার খাওয়া কি হবে না ? তা হলে কে কী বলল শোনার দরকার কী। একবার ইচ্ছে হল সোজা মাসির বাড়িতে গিয়ে আহিরকে ভাল খবরটা শুনিয়ে আসতে। কিন্তু তার বদলে সে কলেজে এল। রাতের কলেজে নাম লেখাবার জন্যে এর ওর কাছে দরবার করতে ভরসা পেল। তাকে আবেদন করতে হবে একজন ক্রিকেটার হিসেবে। স্টেট রিপ্রেজেন্ট করা ক্রিকেটারদের আবেদন কলেজ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে।

বাড়িতে ফিরতেই সে দূর থেকে দেখতে পেল বাইরের ঘরের দরজা খোলা এবং পিতৃদেব খুব দরাজ গলায় কথা বলছেন। এই গলা একমাত্র মাসি বাড়িতে এলেই বেরিয়ে আসে। দরজায় পৌঁছে স্বপ্নাশিষের পা-দুটো পাথর হয়ে গেল। পিতৃদেবের উল্টোদিকে মাসির পাশে বসে আছে আহির। পিতৃদেবের মুখের হাসি তাকে দেখামাত্র উবে গেল।

'কোথায় ছিলে ?'

'চাকরি পেয়েছি।'

'চাকরি সে কি ? পড়া ছেড়ে চাকরি নিতে কে বলেছে ?'

'ক্রিকেট খেলার জন্যে চাকরি। পড়ব রাতের কলেজে।'

'রাতের কলেজ ? তার মানে বাড়ি ফিরতে রাত বারোটায় ?'

'না। সাড়ে নটার মধ্যেই চলে আসব।'

'নিজে যা ভাল বুঝছ তাই করছ। আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছ না ?'

'চাকরিটা আমার দরকার ছিল ?'

'দরকার ? কেন ? এ বাড়ির বিনি পয়সার হোটেলটা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ?'

স্বপ্নাশিষ জবাব না দিয়ে আড়চোখে আহিরের দিকে তাকাল। আহির মাথা নিচু করে বসে আছে। পিতৃদেব মাসিকে বললেন, 'একটু আগে তুমি ওর প্রশংসা করছিলে। দেখলে তো ?'

'আমি তো কোনও খারাপ দেখতে পাচ্ছি না। ও পড়াশুনো করেও

যদি কিছু রোজগার করে আপনার হাতে তুলে দেয় তার চেয়ে আনন্দ আর কী আছে ! কত মাইনে পাবে তুমি ?'

'বাইশশো।'

'এত ? বাঃ। দেখুন, আপনি তো এখন অবসরে আছেন। টাকাটা কত কাজে দেবে।'

'আই ডোন্ট ওয়ান্ট।' পিতৃদেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ছেলের পয়সায় আমি কোনও দিন খাব না। আমার বড় ছেলে এবার ডাক্তার হবে, তাকেও তাই বলেছি।'

মাসি বললেন, 'উঃ, আপনি আবার চেঁচাচ্ছেন ? এই মেয়েটা কী ভাবছে বলুন তো ?'

সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেব গলা নামালেন, 'কিছু মনে করো না মা, অন্যায় দেখলে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি না। কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করিনি।'

'আমার ঠাকুর্দা এ রকম ছিলেন।' নিচু গলায় আহির বলল।

'তাই ? নিশ্চয়ই আদর্শবান মানুষ ছিলেন ?'

'আমি তাঁকে চোখে দেখিনি।'

'অ। তোমার বাবা ?'

'বাবা—।' আহির থমকে গেল।

মাসি বললেন, 'একদম কসাই। ওইটুকুনি মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।'

'সে কী ? কেন ? তোমার দেওরের মেয়ে বললে তো !'

'তাই তো। দেওর বলে কসাইকে কসাই বলব না ? তিনি চান ওর বিয়ে দিতে। এই পড়াশুনা টড়াশুনা জলে যাক। অথচ ওর ইচ্ছে পড়ার। তাই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন।'

'তা বিয়ে করেও তো পড়া যায়।'

'যায় আবার যায়ও না। বিয়ে হলেই তো সংসারের ঝামেলা ঘাড়ে পড়বে। তা ছাড়া ওর ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকার খুব ইচ্ছে। বিবেকানন্দ মুখস্থ।'

'সেটা অবশ্য মন্দ নয়। উনি এটা ঠিক করেননি। আফটার অল মেয়ে। আরে আমার তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এটাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিই। পেরেছি ? তবে আরও অসহ্য হয়ে উঠলে হয় তো পেরে যাব। ছেলে তো, রাস্তায় ঘুরুক।'

'আহা। অমন করে বলবেন না। অত নামকরা ক্রিকেট প্লেয়ারকে তার বাবা এ সব বলছে শুনলে লোকে আপনাকেই দোষ দেবে।' মাসি

প্রতিবাদ করলেন।

'তা ওকে কদিন নিজের কাছে রাখবে ?'

'যদ্দিন ওর বাবা এসে না নিয়ে যায় থাকবে। আমি একা থাকি, আমারও ভাল লাগছে ও আসায়।' মাসি কথা শেষ করামাত্রই একটা জিপ এসে দাঁড়াল। একজন পুলিশ অফিসার দরজায় এলেন, 'স্বপ্নাশিষবাবু আছেন ?'

স্বপ্নাশিষ বলল, 'আমিই স্বপ্নাশিষ।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা।' অফিসারের মুখে হাসি ফুটল, 'আপনি তো ক্রিকেট খেলেন ?'

'হ্যাঁ।' স্বপ্নাশিষ নিজের বুকের ধুকধুকুনি শুনতে পাচ্ছিল।

'আপনাকে ডিস্টার্ব করছি বলে দুঃখিত। আপনি আহির বলে কোনও মেয়েকে চেনেন ?'

'আহির ?'

'হ্যাঁ। শ্যামনগরে থাকে।'

'আলাপ আছে।'

'ব্যাপারটা হল আহিরকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর ব্যাপারে কিছু জানেন ?'

'না।'

এবার পিতৃদেব গলা খুললেন, 'কী নাম বললেন ? আহির ?'

'হ্যাঁ।' অফিসার মাথা নাড়লেন।

'এই নামটা আমি শুনেছি। ইয়েস, ওর মুখেই শুনেছি। কবিতার বই প্রেজেন্ট করেছে ওকে। তখনই বুঝেছিলাম একটা গোলমাল হতে চলেছে।' পিতৃদেব হুঙ্কার দিলেন।'

'কবিতাগুলো কিন্তু সুন্দর।' মাসি মাথা নাড়লেন।

পিতৃদেব চিৎকার করে বললেন, 'আঃ।'

অফিসার বললেন, 'যাদের সঙ্গে কানেকশন থাকতে পারে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আপনি তা হলে জানেন না ?'

'না।'

পিতৃদেব বললেন, 'সত্যি কথা বলছে কি না জানা যাচ্ছে না। ওকে কি অ্যারেস্ট করবেন ?'

'না, এখনই নয়। তা ছাড়া আহিরের সঙ্গে ওদের পাড়ার একটি ছেলেকেও পাওয়া যাচ্ছে না।'

মাসি বললেন, 'তাই বলুন। আপনার ছেলে কোনও দোষ করেনি।'

'মাইট বি ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছে।' পিতৃদেব বললেন।

এবার অফিসার খুশি হলেন, 'আপনার মত সৎ মানুষ কম দেখেছি। আপনি ওর বাবা ?'

'খুব দুঃখজনক হলেও উত্তরটা হ্যাঁ।'

'তা হলে কোনও চিন্তা নেই। প্রয়োজন হলে আমি ডেকে পাঠাব। ছেলেকে থানায় পাঠিয়ে দেবেন।' অফিসার চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই আহিরের মুখ দেখতে পেলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। পকেট থেকে একটা ছবি বের করে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম কী ভাই ?'

আহির তাকাল, 'আহির।'

'সর্বনাশ।' অফিসার পিতৃদেবের দিকে ঘুরলেন, 'আপনাকে আমি সৎলোক বলে প্রশংসা করছিলাম। অথচ নিজের বাড়িতে ওকে শেল্টার দিয়ে আপনি আমার সঙ্গে অভিনয় করলেন ? ছি ছি! আপনাকে, আপনাদের আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'আমি, আমি অভিনয় করেছি ?'

'করেননি ? এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন জানেন না মেয়েটা আপনার নাকের ডগায় বসে আছে।'

'বিশ্বাস করুন আমি জানতাম না।'

এবার মাসি বললেন, 'বাঃ, জামাইবাবু, আপনাকে আমি বলিনি ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার কাছে উঠেছে ? ওর বাবা ওকে জোর করে বিয়ে দিতে চেয়েছিল ?'

'নো। তুমি বলেছ ওর বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'ওই একই হল।' মাসি বললেন, 'শুনুন অফিসার। আহিরের বয়স এখন কুড়ি। ওর আইডেন্টিটি কার্ড আছে, বয়সটা দেখে নিতে পারেন। একটা অ্যাডাল্ট মেয়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে। আপনি কি তাতে বাধা দিতে পারেন ?'

'না, তা পারি না। কিন্তু বয়সটা প্রমাণিত হোক।'

'ও। তা হলে আমাকেও প্রমাণ দিতে হবে আমি অ্যাডাল্ট কি না !'

'এ কী বলছেন। আপনি আর উনি ?'

'কেন ? উনি কি অপরাধ করলেন ? ছয় বছর বয়সে ওয়ানে পড়লে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে আঠারোতে। তার ওপর দু বছর কলেজে যাচ্ছে। কুড়ি হয়নি ?'

'তা অবশ্য। ঠিক আছে, আমি রিপোর্ট পাঠাচ্ছি, উনি এ বাড়িতে আছেন।'

'নো। নেভার।' পিতৃদেব আবার হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এ বাড়িতে নেই।'

'আশ্চর্য! আপনি কথায় কথায় এমন হুঙ্কার দিয়ে মিথ্যে কথা বলেন কেন বলুন তো? উনি এখানে আছেন, আর বলছেন নেই?'

'এসেছিল, চলে যাবে। এরপর যে ছোকরা উধাও হয়েছে সে-ও এখানে হাজির হবে।'

মাসি বললেন, 'যে উধাও হয়েছে তার সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্কে নেই।'

পিতৃদেব বললেন, 'তুমি দেখছি সব নাড়িনক্ষত্র জানো। তা হলে সম্পর্কটা কার সঙ্গে, অ্যাঁ। ধোঁয়া যখন উঠছে তখন পেছনে তো আগুন আছেই।'

'সম্পর্ক আপনার সঙ্গে হবে।'

'তার মানে?' পিতৃদেবের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'ও আপনার পুত্রবধূ হবে।'

'সেকি? অসম্ভব। আমি বেঁচে থাকতে অসম্ভব।' পিতৃদেব স্বপ্নাশিষের দিকে তাকালেন, 'তোমার দাদাকে বলে দিয়ো সে যেন এ বাড়িতে না ঢোকে। দাঁড়াও, দেবু, দেবু, কাম হিয়ার। কুইক।'

দেবাশিষ বোধহয় কাছেই ছিল, দ্রুত ঘরে ঢুকল।

পিতৃদেব বললেন, 'গেট আউট। আভি নিকালো। আমাকে ব্লাফ দেওয়া। ব্রহ্মচারী হবার এই নমুনা? ডাক্তারি পড়তে গিয়ে তলে তলে এই?'

'আমি কিছু করিনি বাবা।' দেবাশিষ মিনমিন করল।

'করোনি? ওকে তুমি চেনো না? ভাই-এর সঙ্গে প্যাক্ট করনি?'

'না। স্বপ্নকে জিজ্ঞাসা করুন। ও আমাকে বলেছিল এ সব করেছে।'

'অ্যাঁ?' পিতৃদেব ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তুমি? গেট আউট।'

'বেশ যাচ্ছি। কয়েক মিনিট সময় দিন।' স্বপ্নাশিষ দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেল। পিতৃদেব এবার অফিসারের দিকে তাকালেন, 'কী? এখনও মনে হচ্ছে আমি অভিনয় করছি?'

অফিসার সেটাকে আমল না দিয়ে আহিরকে বললেন, 'আপনি একবার থানায় আসুন। একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে এই বলে যে আপনি প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্ব ইচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে এসেছেন। কেউ আপনাকে বাধ্য করেনি।'

'সেটা ঠিক নয়। বাবা আমাকে বাধ্য করেছেন।' আহির বলল।

'অ্যাঁ !' অফিসার হকচকিয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ। আমি প্রাপ্তবয়স্কও, উনি আমায় জোর করে বিয়ে দিচ্ছিলেন। বাড়ি থেকে চলে আসা ছাড়া আমার কাছে অন্য পথ খোলা ছিল না।'

অফিসার বললেন, 'বেশ, এই স্টেটমেন্টটাই দিন।'

মাসি এবার পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করবেন ?'

'কী করব মানে ?'

'আপনি ওকে গ্রহণ করুন।'

'ইম্পসিবল। আমি এ সব প্রশ্রয় দিতে পারি না। যে মেয়ে নিজের বাবার সঙ্গে একটা বাইরের ছেলের জন্যে সংঘাতে যেতে পারে সে তো কাল আমাকেও নস্যাৎ করতে পারে। আর উনি তো দু মিনিট সময় চেয়েছেন।'

মাসি বললেন, 'কিন্তু ও যদি এখান থেকে না যায় ?'

আহির প্রতিবাদ করল, 'মাসিমা—।'

'চুপ কর। শুনুন, ও যদি বলে আপনার ছেলের জন্যে ও বাড়ি থেকে চলে এসেছে আর তাই ও এখানেই থাকবে তা হলে আপনি কি ঘাড় ধরে বের করে দেবেন ?'

'ও কি আমার পারমিশন নিয়ে বাড়ি ছেড়েছে ?'

'আপনার ছেলেকে জানিয়ে এসেছে।'

'ও আমার ছেলে নয়, নো মোর।'

'বাঃ, বললেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না।'

পিতৃদেবের গলা পাল্টালেন, 'তুমি, তুমি এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন ?'

'কারণ আপনি ঠিক কাজ করছেন না।'

এই সময় একটা ব্যাগ নিয়ে স্বপ্নাশিষ বেরিয়ে এল, 'চলুন।'

আহির তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মাসি বললেন, 'চিন্তা করে দেখুন। যদ্দিন না বিয়ে হচ্ছে মেয়েটা আমার ওখানেই থাকবে। স্বপ্ন কোথায় থাকবে আমি জানি না।'

পিতৃদেব একটি কথাও বললেন না। পুলিশের জিপে উঠল ওরা। থানায় গিয়ে আহিরের স্টেটমেন্ট দেওয়া চুকে গেলে মাসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে এই কটা দিন। এক বাড়িতে থাকা শোভন নয়।'

'আমি কোথায় থাকব ?'

'ভেবে ঠিক কর। তবে রোজ আসিস। তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।' ওদের পাতাল রেলে তুলে দেবার আগে আহির জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবে ?'

'বুঝতে পারছি না। ভাবছি একবার হরিমাধবদার কাছে যাব।'

'আমার জন্যে, আমার জন্যে এমন বিপদে পড়লে তুমি!' আহিরের চোখ জলে জলাকার। মাসি ডাকলেন, 'কী রে, আয়!'

সব শুনে হরিমাধবদা বললেন, 'এখনই প্রেম না করলে কি চলছিল না?'

'আমি ইচ্ছে করে করিনি।'

'ইচ্ছে করে করিনি! বলটা নিজে এসে আমার ব্যাটের কোণে লাগায় ক্যাচ উঠল আর আমি আউট হলাম। ওয়ার্থলেস।

'আমাকে কয়েকটা দিন এখানে থাকতে দেবেন?'

'কেন?'

'আমার এই মুহূর্তে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

'সেটা আমার সমস্যা নয়। উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না। এখন তোর ক্যারিয়ার তৈরি করার সময়। মন ঠিক করে রঞ্জি খেলবি, দিলীপ খেলবি, চেষ্টা করবি ইন্ডিয়ায় ঢুকতে তা না করে প্রেম করে বসলি। চমৎকার। নিজের কফিনে নিজেই পেরেক ঠুকছিস। শোন, মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দে।'

'অসম্ভব। আমি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।'

'ক্রিকেটের চেয়ে একটা মেয়ে তোর কাছে বড় হল?'

'না। কেউ কারও চেয়ে বড় নয়। ও থাকলে আমি আরও ভাল খেলতে পারব।'

'হয় না। বাড়িতে শান্তি না থাকলে কোনও লেখক শিল্পী খেলোয়াড় সফল হতে পারে না। এটা কেরানিগিরি নয়।'

'আপনি আহিরকে দেখলে এই সব কথা বলতেন না।'

'কেন?'

'ওকে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়!'

'যা ব্বাবা! তুই আমার সামনে প্রেমের ডায়ালগ বলছিস?'

'আমি সত্যি কথা বলছি।'

'বেশ, তুই যখন মরতে চাস আমি তোকে বাঁচাতে পারব না। আমি নিজে বিয়ে থা করিনি, এ সব বুঝি না। তবে দয়া করে এখানে তাকে এনো না।'

'আমি তা হলে এখানে থাকতে পারি?'

'কী আর করা যাবে? ছাত্র পুত্রের সমান। তোর নিজের বাবা যা দুদিন বাদে করবেন আজ তা আমি করলাম। তবে একটাই কন্ডিশন,

ভাল খেলতে হবে। মাঠে বদনাম হলে এ বাড়ি ছাড়তে হবে তোমাকে, মনে রেখো কথাটা।'

অসমের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে প্রথম এগারো জনের মধ্যে স্বপ্নাশিষের নাম দেখা গেল। বাবুল বোস বলল, 'অনেক ফাটাফাটির পর টিমে ঢুকলে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো ? কটকে কেউ তোমার জন্যে কিছু বলেনি, এ বার এত প্রেসার যে সুঁটেদাকে হাত গোটাতে হল। সন্তোষদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি ?'

স্বপ্নাশিষ বলল, 'আমি খেলতে না পারলে কোনও দাদা তো খেলে দেবে না। অতএব উত্তরটা ম্যাচের শেষে দেওয়া ভাল। তাই না ?'

স্বপ্নাশিষ ঠিক করেছিল প্রতিটি বল বুঝেসুঝে খেলবে, রিস্কি শট নেবে না। হরিমাধবদা মাঠে এসেছেন। অসমের বোলিং তেমন শক্তিশালী নয়। তবু প্রথম ঘণ্টায় দুটো উইকেট পড়ে গেল। বেশি ধরে খেলায় ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছিল না কিন্তু রান পাচ্ছিল না স্বপ্নাশিষ। ব্যাপারটা ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে পড়ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল সে তার নিজের খেলা খেলছে না অন্যের ভূমিকায় অভিনয় করছে। আজ মাঠে আহির এসেছে। কথা হয়নি কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়েছে মাঠে ঢোকার সময়। হঠাৎ স্বপ্নাশিষ মত পাল্টাল। সে তার নিজের খেলা খেলবে শুধু অফ্-এর বল ছেড়ে দেবে। ইনিংস শেষেও নট আউট থেকে তিরিশ করার চেয়ে স্বাভাবিক খেলাই খেলা ভাল। এবার মারতে লাগল সে। দ্রুত রান উঠছে। লাঞ্চেই তার রান সত্তর হয়ে গেল। মাঠের বাইরে আসতেই হরিমাধবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রথম ঘণ্টায় ইঁদুর হয়ে ছিলি কেন ? এই বোলিং-এর বিরুদ্ধে ওই খেলা ? এখন যা খেলছিস তাই খেলে যা।'

স্বপ্নাশিষ বলল, 'একটা কথা বলব ?'

'বল্।'

'ওই যে মেয়েটি বসে আছে, ও আহির।'

'আহির ?'

'হ্যাঁ। আমার পক্ষে তো যাওয়ার উপায় নেই, আপনি একটু কথা বলবেন।'

'আমি ? আমি কী কথা বলব ?'

স্বপ্নাশিষকে একজন ডাকতেই সে বাধ্য হল চলে যেতে।

দিনের শেষে স্বপ্নাশিষ দুশো দুই নট আউট। মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতেই তাকে নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু হল যে দমবন্ধ হবার জোগাড়। যেন বাংলা আজই ম্যাচ জিতে ফেলেছে। একটু ফাঁকা হতেই

ভজুবাবু এলেন, 'শুনলাম সন্তোষ নাকি টোপ ফেলেছে। কত মাইনে দিচ্ছে ?'

'কেন ?'

'সুঁটেদা এখন সাড়ে তিন হাজার দেবে। স্টেট ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু আমি যে কন্ট্রাক্ট সই করে ফেলেছি।'

'সি এ বিতে তো করলি ওটা বাতিল করে দেবে ল'ইয়ার।'

'কিন্তু তাতে আমার কথার দাম থাকবে না ভজুদা। তা ছাড়া আমার পক্ষে ভোলা মুশকিল আপনারা কটকে নিয়ে গিয়ে আমাকে মাঠের বাইরে বসিয়ে রেখেছেন।'

'আমরা করেছি কে বলল ?'

'এর উত্তর আপনিই ভাল জানেন।'

তিনটে দিন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। বাংলা ইনিংসে জিতল। প্রত্যেকটা কাগজ স্বপ্নাশিষের ছবি ছেপেছে। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা কলম লিখেছে ওর প্রশংসা করে। একজন লিখেছেন, অমল মজুমদার বা নিখিল হলদিপুরকে নিয়ে যে নাচানাচি হয়েছে তার থেকে অনেক গুণ ভরসা করা যায় স্বপ্নাশিষের ওপর।'

৬

বিয়ের আগের দিন মাসি গিয়েছিলেন শ্যামনগরে। স্বপ্নাশিষের অনুরোধে সুব্রত নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। গিয়েছিলেন সকালবেলায়, আহির যখন কলেজে। কিছুদিন থেকে আহির রোজ কলেজে যাচ্ছে। কেউ তাকে বাধা দেয়নি, জিজ্ঞাসা করার জন্যেও মুখোমুখি হয়নি। মাসির শ্যামনগরে যাওয়া নিয়ে তার আপত্তি ছিল। পুলিশের কাছ থেকে জানার পরও যারা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি তাদের জানানোর কী দরকার। মাসি শোনেননি ওর কথা। বলেছেন, 'হাজার হোক ওঁরা তোকে পৃথিবীতে এনেছেন, বড় করেছেন। আমাদের কর্তব্য তোর এমন সুখবর ওঁদের জানানো। তারপর ওঁরা যা করবেন সেটা ওঁদের ব্যাপার।'

সন্ধেবেলায় মাসির বাড়িতে প্রায় মিটিং বসে গিয়েছিল। স্বপ্নাশিষ ছাড়া হরিমাধবদা ছিলেন, সুব্রতও এসেছিল। আহির বলেছিল, 'আমার খবরটা ওদের কাছে তো সুখবর নয়।'

কিন্তু হরিমাধবদা মাসিকে সমর্থন করেছিলেন। জানানো দরকার।

শুধু শ্যামনগর নয়, স্বপ্নাশিষের বাবাকেও এবং সেই দায়িত্ব তিনি নেবেন। এর মধ্যে বিহারের বিরুদ্ধেও স্বপ্নাশিষ একশো দশ করায় হরিমাধবদা এখন আকাশের মতো হৃদয় নিয়ে কথা বলছেন। মোহনলাল মিশ্র স্ট্রিটে তাঁর দিদির বাড়ির তিনতলায় দুখানা ঘরের এক ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেছেন স্বপ্নাশিষদের জন্যে। দিদির বয়স হয়েছে, জামাইবাবুরও। ছেলেমেয়ে নেই। ভাড়া দেবার কথা ওঁরা কখনও ভাবেননি। হরিমাধবদাই অনেক বলে রাজি করিয়েছেন। সেই ফ্ল্যাটে খাট টেবিল আলমারি সবই রয়েছে। পুরনো দিনের ভারী আসবাব, সরানোও যাবে না। সরিয়ে রাখারও জায়গা নেই। অতএব স্বপ্নাশিষদের সুবিধেই হবে।

এগারোটার মধ্যেই ফিরে এলেন মাসি। ঠিক ছিল আহিরকে নিয়ে মাসি আসবেন ধর্মতলায় রেজিস্ট্রারের অফিসে, হরিমাধবদা যাবেন স্বপ্নাশিষ এবং সুব্রতকে নিয়ে। অতএব সুব্রতর মুখে শুনতে পেল স্বপ্নাশিষ। আহিরের বাবা বলেছেন, মেয়ে নিজে বিয়ে করছে করুক, তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি এই বিয়েতে নেই।' মাসি অনেক অনুরোধ করেছেন কিন্তু তিনি শোনেননি। উল্টে বলেছেন, 'ছেলের বাবাও নাকি ওদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তা তিনি যদি এসে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলেই আমি বিবেচনা করতে পারি। ছেলে যে অন্যায় করেছে তার জন্যে তাঁকেই তো ফলভোগ করতে হবে।'

অতএব তিনটে একত্রিশ মিনিটে সইসাবুদ হয়ে গেল। নবদম্পতীকে দুজন বয়স্ক আশীর্বাদ করল, একজন অভিনন্দন। মাসির ইচ্ছে ছিল সেই রাতটা তাঁর বাড়িতেই ওরা কাটাক। হরিমাধবদা আপত্তি করলেন। এখন থেকে জীবনযুদ্ধে ওদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে। সমস্যা যা আসবে তা ওদেরই সমাধান করতে হবে। ঠোক্কর খেতে খেতে শিখবে ওরা। আর সেটা আজকের রাত থেকেই শুরু হোক।

সবাই মিলে ওদের নিয়ে এল মোহনলাল মিশ্র স্ট্রিটে। হরিমাধবদার দিদি বরণ করলেন, শাঁখ বাজালেন, মিষ্টি মুখ হল। হরিমাধবদা ভাল হোটেল থেকে খাবার আনালেন। সবাই যখন ওদের একা রেখে বিদায় নিল তখন রাত নটা।

ঘরের দরজা খোলা, জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নাশিষ দেখল আহির চোখ বন্ধ করে বসে আছে। সে কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'বাবার কথা মনে পড়ছে।'

'বাবা?'

'হ্যাঁ।' আহির চোখ খুলল, 'মনে এলে কী করব!'

'ঠিক আছে।' স্বপ্নাশিষ অস্বস্তি নিয়ে বলল। যে বাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে আহির সেই বাবার কথা এই মুহূর্তে মনে আসছে কেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'থাকার জায়গা কেমন হয়েছে?'

'অ্যাঁ? ভাল। এত ভাল হবে আশা করিনি।'

'হরিমাধবদার দিদি কিন্তু গার্জেনগিরি করবে।'

'করুক। মাথার ওপর কেউ থাকলে তো ভাল।' আহির উঠে দাঁড়াল।

স্বপ্নাশিষ আহিরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাস করল, 'তুমি খুশি?'

আহির স্বপ্নাশিষের বুকে মাথা রাখল। একটা নরম উত্তাপ পলকেই সঞ্চারিত হয়ে গেল স্বপ্নাশিষের সমস্ত শরীরে। আহিরের শরীরের স্পর্শ, গন্ধ এবং এ-সব মিলেমিশে আর এক অনুভূতি তীব্র গতিতে তাকে নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল দূরে কোথাও, বহুদূরে যেখানে সে কোনওদিন যায়নি। দুহাতে জড়িয়ে ধরল সে আহিরকে। আহির মুখ তুলল, 'আই লাভ ইউ।'

এ এক স্বপ্নের জীবন। ঘুম ভাঙলেই আহিরের মুখ, ঘুমোতে যাওয়ার আগে সেই মুখে ছড়ানো শান্তি মেখে নেওয়া। এতদিন বাইরে দেখা হত, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সাজগোজ করা আহিরকে দেখতে হত। এখন আটপৌরে আহিরও আর এক ধরনের ভাললাগা তৈরি করছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা তৈরি করে দুজনে বের হয়। আহির যায় কলেজে, স্বপ্নাশিষ মাঠে। আহির কলেজ থেকে ফেরার আগেই স্বপ্নাশিষকে বেরিয়ে যেতে হয় মাঠে কিংবা অফিসে। সকালের রান্নাখাওয়ার কোনটাই সম্ভব হয় না তার পক্ষে। এ নিয়ে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা আহিরের। স্বপ্নাশিষের ক্যান্টিনে খাওয়া সে পছন্দ করে না কিন্তু কোনও উপায়ও তো নেই।

এক রবিবার সকালে সে বলল, 'আজ আমি যা বলব তা করতে হবে তোমাকে।'

'যেমন?'

'তোমাকে মিনিমাম কয়েকটা রান্না শিখতে হবে।'

'কী দরকার?'

'দরকার আছে। ধরো, আমি অসুস্থ, বিছানা থেকে নামতে পারছি না। তুমি যদি সামান্য কিছু রাঁধতে শিখে নাও তাহলে খাওয়ার কোনও

প্রব্লেম হবে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু তুমি অসুস্থ হবে কেন ?'

'আশ্চর্য ! শরীরের কথা কেউ বলতে পারে ?'

'তুমি অসুস্থ হলে আমি মরে যাব।'

'বাঃ। চমৎকার। উনি আমাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে রেখে মরে যাবেন আর আমার কী হবে তা একবারও চিন্তা করলেন না।' আহির স্বপ্নাশিষের ঠোঁটে আঙুল রাখল, 'কক্ষনো ওসব কথা বলবে না। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমার কিছু হলে আমি আত্মহত্যা করব। বুঝলে ? খারাপ কথা একদম উচ্চারণ করবে না।'

স্বপ্নাশিষ আহিরকে জড়িয়ে ধরল। যেন দুহাত দিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করল শব্দগুলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ জড়িয়ে রইল আহির।

রান্নাঘরে ঢুকে স্বপ্নাশিষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এ-সব শিখলে কখন ?'

'ইচ্ছে থাকলেই শেখা যায়। যারা খাওয়াতে ভালবাসে তাদের মধ্যে আপনা থেকেই একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করে মশাই। আপনাকে শুধু ভাত ডাল আর মাছের ঝোল তৈরি করা শিখতে হবে। শিখলে আমি কৃতার্থ হব। বলো তো দুজনের জন্যে তুমি কতখানি চাল নেবে ?' আহির কোমরে শাড়ি জড়াল।

'হাফ কিলো।'

'হাফ কিলো চালের ভাত আমরা দুজনে খাই ?' মাথা নাড়ল আহির, 'নিজে তো মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে খেতেই চাও না। ম্যাক্সিমাম তিনশো গ্রাম। এই যে কৌটো দেখছ তার দেড় কৌটো।'

কিন্তু আহিরের ক্লাশ নেওয়া হল না। সুব্রত এল, 'ম্যাডাম, চা খাওয়াবেন।'

'আপনারা প্লেয়াররা যখন তখন চা খান ?'

'এই রে ! স্টকে বুঝি চা নেই ?'

'থাকবে না কেন ?'

'তা হলে ঠিক আছে। চাকে লোকে আর নেশার জিনিষ মনে করে না। এই যেমন ধরুন শালা শব্দটা। আগে গালাগালি হিসেবে ব্যবহৃত হত। বড়দের সামনে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। এখন জলভাত। কলকাতার বেশিরভাগ ছেলেকে দেখবেন একটা অশ্লীল শব্দ কথার ফাঁকে অসাড়ে গুঁজে উচ্চারণ করে চলেছে। কোনও বিকার নেই। কাল বাদে পরশু দেখবেন সেটা শুনতে তেমন খারাপ লাগবে না।'

'আপনি বড্ড বকেন।' আহির হেসে ফেলল।

'তুই রান্নাঘরে কী করছিলি ?'

'রান্না শিখছিলাম।'

'সর্বনাশ। তোর বারোটা বেজে গেছে।'

রান্নাঘর থেকে আহিরের গলা ভেসে এল, 'সর্বনাশ কেন ?'

'বাড়িতে খাবার না থাকলে দোকান আছে, পরিশ্রম করার কী দরকার ? যাকগে, তুই নিশ্চয়ই যাবি না, আমি যাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'শ্যামনগরে। সেই মাঠে আবার টুর্নামেন্ট হচ্ছে। খেপ।'

'তুই এখনও খেপ খেলে যাচ্ছিস ?'

'সবাই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে চাকরির, কেউ দিচ্ছে না। ওটা পেয়ে গেলে খেপ খেলা ছেড়ে দেব। আগে টাকা না পেলে যাব না বলে দিয়েছি।'

হঠাৎ স্বপ্নাশিষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই রঞ্জি খেলার স্বপ্ন দেখিস না ?'

'নো। আমি আমার ক্ষমতা জানি। তুই সোবার্স রিচার্ড কিংবা জাভেদ মিঁয়াদাদ হবার স্বপ্ন দেখিস ? তবে ?' সুব্রত হাসল।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আহির বলল, 'কিন্তু পরের প্রজন্মের কেউ স্বপ্নাশিষ হবার স্বপ্ন দেখবে সেই চেষ্টা তো ওকে করতে হবে।'

'বাঃ। চমৎকার বলেছেন। আঃ, এরকম বউ পেলে রঞ্জি কেন, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার স্বপ্ন দেখতাম আমি। গ্র্যান্ড।' হৈ হৈ করে উঠল সুব্রত।

চায়ের কাপ নিয়ে এসে আহির জিজ্ঞাসা করল, 'শ্যামনগরে খেলা কবে ?'

'শনিবার।'

আহির স্বপ্নাশিষের দিকে তাকাল, 'এ বাড়ির ঠিকানাটা ওঁদের জানাবে ?'

স্বপ্নাশিষ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। এই কিছুদিনে সে অনুভব করেছে শ্যামনগরের প্রিয়জনেরা আহিরকে খুব টানে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে কিন্তু অস্বীকার করতে পারেনি। ব্যাপারটা তার ভাল লেগেছে। একদা যাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক ছিল একটা ঝড়ে তার সমস্তটা যারা মুছে দেয় তাদের কখনই বিশ্বাস করা চলে না।

সুব্রত বলল, 'ঠিক আছে। আমি সোজা কড়া নেড়ে ঠিকানাটা দিয়ে আসব।'

বলার ধরনে হেসে ফেলল আহির, 'ঠিক আছে। আর বাপীকে এখানে আসতে বলবেন।'

'কে বাপী ?' সুব্রত জানতে চাইল।

স্বপ্নাশিষ বলল, 'শ্যামনগরের ওই মাঠটার পাশেই থাকে। ওর বন্ধু।'

'ক্যান্ডিডেট ছিল নাকি ?'

আহির চেঁচিয়ে উঠল, 'ফাজলামি করবেন না। ও আমার খুব ভাল বন্ধু।'

বাপীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে পুলিশ অফিসার স্বপ্নাশিষের বাড়িতে এসে জানিয়েছিলেন। সেই যে বাপী আহিরকে তার দিদির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল তারপর থেকে একবারও আসেনি। মাসীর বাড়িটা ও না চিনতে পারে কিন্তু খেলার মাঠে গিয়ে দেখা করতে পারত কিন্তু করেনি। স্বপ্নাশিষের মনে হল আহির বাপীর খোঁজ নিতে বলে ভালই করেছে। বাপী না থাকলে তার পক্ষে আহিরের কাছে পৌঁছানো সহজ হত না।

ওদের জীবন ওদের মতনই চলছিল। সেই ভোরবেলায় দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়, আবার দেখা হতে হতে রাত দশটা। অফিস বা খেলার মাঠ থেকে কলেজ করে বাড়ি ফেরে স্বপ্নাশিষ। তখন ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। আর সকাল সাড়ে দশটায় বাড়িতে ফিরে ততক্ষণ একদম একা থাকতে হয় আহিরকে। হরিমাধবদার দিদির কাছে কয়েকবার গিয়েছে সে। তিনি বেশি কথা বলার মানুষ নন। অতএব সময় কাটতেই চায় না আহিরের। এরমধ্যে সে একটা অ্যাডভেঞ্চার করেছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়িতে না ফিরে স্টেশনে চলে গিয়েছিল। খালি ট্রেন ধরে নেমেছিল ইছাপুরে। তারপর সেখান থেকে শেয়ারের অটোয় চেপে শ্যামনগরে। মাথায় ঘোমটা টেনে একটা রিকশায় চেপে ঘুরে এসেছিল বাড়ির সামনে দিয়ে। সেই ভরদুপুরে রাস্তায় লোকজন ছিল না। পাড়ার দু-একজন পরিচিত মানুষকে দেখতে পেয়েছিল। তারা লক্ষ করেনি কেউ ঘোমটা মাথায় রিকশায় বসে তাদের দেখছে কিনা। বাড়ির কেউ অথবা বাপীকে দেখতে পাওয়া যায়নি। বিকেল তিনটের মধ্যে ফিরে এসে খাটে শুয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল সে। তারপর নিজের কাছেই পুরো ব্যাপারটা বোকা বোকা বলে মনে হয়েছিল। রাত্রে স্বপ্নাশিষ ফেরামাত্র সব কথা বলে দিল সে।

স্বপ্নাশিষ অবাক, 'কী হয়েছিল ?'

'মানে ?'

'হঠাৎ গেলে কেন ?'

'জানি না। আগে ভেবে যাইনি। হঠাৎ মনে হল, তুমি রাগ করলে ?'

'না। তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও ?'

'না।'

'চলো না। প্রথমে বাপীর বাড়িতে যাব। ওকে দিয়ে খবর পাঠাব। ওঁদের যদি আপত্তি না থাকে তা হলে তুমি দেখা করে আসবে।'

'তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছ এরমধ্যে ?'

'না। মিছিমিছি অপমানিত হবার কোনও মানে হয় না।'

'আমারও একই কথা। আজ আমাকে নিশ্চয়ই পেত্নীতে ভর করেছিল। কথা দিচ্ছি আর কখনও এমন কাণ্ড ঘটবে না।'

রবিবার সকালে সুব্রত এল। সপ্তাহে ওই একদিন প্র্যাকটিসে যায় না। সুব্রত এসে বলল, 'স্বপ্ন, তোকে কিরকম লোক লোক দেখাচ্ছে।'

'মানে ?'

'বেশ বয়স্ক। বিয়ে থা করলে বোধহয় এমন হয়।'

'গিয়েছিলি ?'

'ইয়েস।' আহিরের দিকে তাকাল সুব্রত, 'তোমার বাবা বাড়িতে ছিলেন না। সম্ভবত তোমার মা দরজা খুলেছিলেন। তাঁর হাতে তোমাদের ঠিকানা লেখা কাগজটা দিলাম। উনি দেখলেন, কিছু বললেন না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলতে হবে ?' উনি বললেন, 'না।' আমি চলে এলাম।'

'বাপীর দেখা পেয়েছেন ?' আহির জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। আপনি ওকে আপনার বন্ধু বলেছিলেন ?'

'নিশ্চয়ইই।'

'সে কি বলল জানেন ?' আমি যদি ইচ্ছে করতাম তাহলে নিজেই ওদের সঙ্গে দেখা করে আসতাম। সেটা যখন করিনি তখন ওদের বোঝা উচিত ছিল আমার কোনও ইচ্ছে নেই। ওরা ভাল থাকুক, ব্যস।'

'এ কথা বলল বাপী ?' আহির বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'এত সাজিয়ে এইসব কথা বাপী বলতেই পারে না। ও হৈ হৈ করা ছেলে।'

'আমি মিথ্যে বলব কেন ?'

'না না তা বলছি না। ওর আবার কী হল ?' আহিরকে চিন্তিত দেখাল।

হঠাৎ স্বপ্নাশিষ বলল, 'যেদিন তোমার চিঠি নিয়ে ও এসেছিল সেদিনও ওকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করছে।'

সুব্রত বলল, 'ম্যাডাম, আপনি ওকে নিশ্চয়ই বন্ধু বলে মনে করেন

কিন্তু ও হয়তো মনে মনে আপনার সম্পর্কে অন্য কিছু ভাবত।'

আহির তীব্র প্রতিবাদ করল, 'অসম্ভব।'

সুব্রত প্রসঙ্গ ঘোরালো। স্পপ্নাশিষ দেখল প্রসঙ্গান্তরে গিয়েও আহির খুব সহজ হতে পারছে না। সুব্রত চলে যাওয়ার পর আবার কথা তুলল আহির, 'আমি ভাবতেই পারছি না, জানো।'

'ছেড়ে দাও তো, সুব্রত কী শুনতে কী শুনেছে!'

'কিন্তু কখনও বাপী সামনে এলে আমি আগের মতো কথা বলতে পারব না।'

৭

বাংলা পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ান হল। পরের খেলার জন্যে দিল্লিতে যেতে হবে। চিন্তায় পড়ে গেল স্বপ্নাশিষ। হরিমাধবদার দিদির বাড়িটায় যথেষ্ট নিরাপদে আছে ওরা কিন্তু সে কলকাতার বাইরে গেলে এতবড় শহরে আহিরকে একা থাকতে হবে। তখন যদি কিছু হয়? রাস্তাঘাটে অ্যাকসিডেন্ট হলে—! স্বপ্নাশিষ আহিরকে বলেছিল ওই কয়েকদিন মাসির বাড়িতে থাকতে। মাসির সঙ্গে যদিও এখন নিয়মিত যোগাযোগ নেই, সময়ের অভাবেই সেটা হয়েছে তবু ওদের ওই একটা দরজা খোলা রয়েছে। আহির রাজি হয়নি। মাসির বাড়িতে এমনি যেতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু স্বপ্নাশিষ নেই বলে প্রয়োজন হয়ে পড়ায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকতে ওর একটুও ভাল লাগবে না। আহির জেদ করে বসে আছে, সে একাই থাকবে। পরীক্ষা এসে যাচ্ছে। একা থাকতে তার কোনও অসুবিধে হবে না।

দিল্লি রওনা হবার তিনদিন আগে মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নাশিষের। সে দেখল আহির বিছানায় বসে কাঁদছে। মাঝে মাঝে ককিয়ে উঠছে। ধড়মড়িয়ে উঠল স্বপ্নাশিষ। দুহাতে আহিরের কাঁধ আঁকড়ে ধরে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে? এই?'

'কিছু না।' কান্না চাপতে চেষ্টা করল আহির।

'কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে।'

হঠাৎ স্বপ্নাশিষের কাঁধে মাথা গুঁজে শব্দ করে কেঁদে উঠল আহির, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' স্বপ্নাশিষ শক্ত হয়ে গেল। এতদিন, এতদিন পর ভেঙে পড়ল আহির? বাবামাকে ছেড়ে এইভাবে একা থাকার লড়াইতে হেরে গেল? সে নিচু গলায় বলল, 'তুমি কি শ্যামনগরে যেতে চাও?'

'না।' ত্রস্তে বলে উঠল আহির।

'তা হলে শক্ত হও। এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন?'

'তোমার শ্যামনগরের কথা মনে হচ্ছে কেন?' দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞাসা করল আহির। এবং তখনই স্বপ্নাশিষের খেয়াল হল। আহির কোনও শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারার কথা বলছে। সে ওকে শুইয়ে দিতে চাইল কিন্তু আহির আপত্তি করল, 'শুতে পারছি না। শুলে যন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছে।'

'কোথায় হচ্ছে যন্ত্রণা? পেটে?'

'হ্যাঁ। উঃ, মাগো।'

বাড়িতে ডিসপিরিন আছে। সেটা মাথার যন্ত্রণা সারায়, পেটের বেলায় কাজ করে কিনা জানা নেই। কিন্তু স্বপ্নাশিষের মনে হল কিছুটা কাজ হলেও হতে পারে। এত রাত্রে কোথায় ডাক্তার পাবে? সে ডিসপিরিন আর জল এনে দিল। আহির সেটা খেল। কিন্তু তার যন্ত্রণা কমছিল না। আহিরের মুখ নীল হয়ে গেছে। অথচ সে কিছুই করতে পারবে না। আহির তার জীবন, তার সব। আহিরের সুখে তার সুখ, কষ্টে—। হঠাৎ মনে হল এই কথাগুলো ভাবা যত সহজ বাস্তবে তা নয়। যে কষ্ট এখন আহির পাচ্ছে তার দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া সে কিছুই করতে পারছে না। আহির বাথরুমে যাবে। ধরে ধরে তাকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতেই আহির বলল, 'তুমি ছেড়ে দাও।'

'দরজা বন্ধ করতে হবে না।'

'অসম্ভব।'

'না। তুমি পড়ে যেতে পারো।'

'ওঃ। দোহাই, আমাকে চেঞ্জ করতে হবে।'

শিথিল হয়ে গেল স্বপ্নাশিষ। আহির দরজা বন্ধ করল। এটা তা হলে মেয়েলি ব্যাপার। মাসের কয়েকটা দিন আহির নিজেকে গুটিয়ে রাখে। তখন গায়ে হাত দিতেও দেয় না। স্বপ্নাশিষ মেনে নিয়েছিল। মেয়েলি ব্যাপারটা সম্পর্কে তার কোনও ধারণা ছিল না, আগ্রহও নেই। গত মাসে ওই চারদিন কলেজে যায়নি সে। জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, ব্লিডিং বেশি হচ্ছে। সে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা বললে আহির হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না তো!' জন্মাবধি বাড়িতে কোনও মহিলাকে সে দেখেনি। কেলোর মা শুধু দুবেলা আসাযাওয়া করেছে। মহিলাদের এই সমস্যা তার অজানা। স্বপ্নাশিষ একবার ভাবল হরিমাধবদার দিদিকে ডেকে নিয়ে আসবে কিনা। এত রাত্রে ওঁকে বিব্রত করতে সঙ্কোচ হল। তা ছাড়া এতে আহিরও অসন্তুষ্ট

হতে পারে।

সারারাত যন্ত্রণা আর জেগে থাকায় কাটল। সকালে আলো ফুটতেই ডাক্তারের কাছে ছুটে যাচ্ছিল স্বপ্নাশিষ, আহির বাধা দিল, 'কোন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ ?'

'মোড়ের মাথায় একজন বসেন, খুব ভিড় হয় দেখেছি। ওই বাড়িতেই থাকেন উনি।'

'না না। যাওয়ার দরকার নেই, আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।'

'অসম্ভব। আমি তোমার আপত্তি আর শুনছি না।'

'তা হলে কোনও গাইনির কাছে যাও।'

'গাইনি ?' হকচকিয়ে গেল স্বপ্নাশিষ।

'এই অসুখ সম্পর্কে ওঁরাই ভাল জানেন।'

সকালবেলায় কিছুটা খোঁজাখুঁজির পর একজন গাইনোকোলজিস্টের কাছে পৌঁছাতে পারল সে। স্বপ্নাশিষের মুখে যতটা সে জানে শোনার পর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর আগে যখন এমন হয়েছে তখন কি ওষুধ খেতেন উনি ?'

'আমি জানি না। কখনও এমন কষ্ট পেতে দেখিনি আমি। আপনি একবার চলুন।'

স্বপ্নাশিষ পরে বুঝেছে সে সেদিন অকস্মাৎই একজন ভাল মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ডাক্তার হিসেবে কল্যাণ দত্তের নাম যতটা ঠিক ততটাই বদনাম চোখা চোখা কথা বলার জন্যে। পান থেকে চুন খসলে সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু মানুষ হিসেবে লোকটা খুবই ভাল।

আহিরকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ির আর সব কোথায় ?'

আহির শুয়েছিল বিছানায়। চোখ বন্ধ করল। স্বপ্নাশিষ বলল, 'আমরাই থাকি এখানে।'

'তোমাদের যা বয়স তাতে তো একসঙ্গে থাকার কথা নয়, বিয়ে করেও নয়। কী করো তুমি ?'

'চাকরি করি আর পড়ি। ক্রিকেট খেলি।'

'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আছ ?'

'না। বাড়িকে জানিয়েই বিয়ে করেছি।'

'হুম্। কি জানো।' আহিরের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর ডাক্তার দত্ত ভাবলেন, 'এখন ও অসুস্থ। আগে যন্ত্রণা কমুক, ব্লিডিং বন্ধ হোক। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ঠিকঠাক খাওয়াবে। আর একদম বেড রেস্ট। কিন্তু এতেও যন্ত্রণা না কমে

ইঞ্জেকশন দিতে হবে। বাড়িতে আর কেউ নেই ?'

'না।'

'দেখো আজকের দিনটা।' ডাক্তার উঠলেন, 'একটা আলট্রাসোগ্রাফি করানো দরকার।'

অফিসে যাওয়ার প্রশ্নই নেই যদিও আহির খুব জেদ করেছিল, সে একাই থাকতে পারবে। খবর পেয়ে হরিমাধবদার দিদি এলেন। তাঁকে কিছু না জানানোর জন্যে অনুযোগ করলেন। স্বপ্নাশিষ ওষুধ আনল কিন্তু সারাদিনেও তেমন পরিবর্তন দেখা গেল না। চারটের সময় সে ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিতেই তিনি সোজা গাড়ি নিয়ে চলে এলেন স্বপ্নাশিষকে পাশে বসিয়ে। বললেন, 'তুমি কী রোজগার করো জানি না কিন্তু ওকে আমি এখনই নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছি। তেমন বুঝলে কাল ছেড়ে দেব কিন্তু আজ সারারাত তোমার মত আনাড়ির সামনে শুয়ে মেয়েটা কষ্ট পাক আমি চাই না।'

আহিরের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও তাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হল। রাত দশটায় বাড়ি ফেরার সময় স্বপ্নাশিষ জানতে পারল আহির ঘুমোচ্ছে। ঘুম যখন এসেছে তখন শরীরের যন্ত্রণা নিশ্চয়ই তীব্র নেই। হরিমাধবদা খবর পেয়ে এসেছিলেন নার্সিং হোমে। কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নার্ভাস হবার কিছু নেই। শরীর থাকলেই অসুস্থ হবে। চল, আমার ওখান থেকে রাতের খাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরবি।'

যেতে যেতে হরিমাধবদা বললেন, 'শোন স্বপ্ন, কাল যদি সব ঠিক হয়ে যায় তা হলে অন্য কথা নইলে ওর বাবা-মাকে খবর দিবি।'

স্বপ্নাশিষ চুপ করে রইল। হরিমাধবদা বললেন, 'ব্যাপারটা তোর একার পক্ষে সামলে নেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। তা ছাড়া কদিন পরেই দিল্লি যাবি। আজ প্র্যাকটিস হল না তোর। এরকম করলে দিল্লি যেতেই পারবি না।'

'আহির সুস্থ না হলে আমি কোথাও যাব না।' শক্ত গলায় বলল স্বপ্নাশিষ।

'তার মানে ? ওর যদি সুস্থ হতে দশদিন লাগে তুই দিল্লির ম্যাচ খেলবি না ?'

'আমি খেলতে পারব না।'

'ওহো, স্বপ্ন ! তুই নিজেকে শক্ত কর। দিল্লিতে তোকেই খেলতেই হবে। জোনাল ম্যাচে যত ভালই খেলিস নির্বাচকদের নজরে পড়বি না। এখন থেকে প্রতিটি খেলা তোর কাছে ইম্পর্ট্যান্ট।'

'আমি সব জানি। কিন্তু তার থেকে ইম্পর্ট্যান্ট ওর পাশে থাকা।'

রাত এগারোটায় ঘরে ফিরে প্রচণ্ড কান্না পেল স্বপ্নাশিষের। চারধার নিস্তব্ধ, এই ঘরে আহির নেই অথচ আহিরের ব্যবহৃত সব জিনিষ চারপাশে ছড়িয়ে আছে। জীবনে প্রথমবার তার নিজেকে একদম একা বলে মনে হতেই কান্নাটা তীব্র হল।

পরদিন সকালে আহির অনেকটা সহজ। দেখা হতেই বলল, 'বাড়ি যাব।'

মন ভাল হয়ে গেল স্বপ্নাশিষের। পাশে বসে বলল, 'কষ্ট আর নেই?'

'না। একদম না। এখানে আর থাকার দরকার নেই। তুমি আজ প্র্যাকটিসে যাওনি কেন? এটা খুব অন্যায়।' চোখ পাকাল আহির।

নার্সিং হোম থেকে সোজা ইডেনে চলে গেল সে। ম্যানেজারকে আহিরের অসুস্থতার কথা জানাল। ভদ্রলোক বললেন, 'মুশকিলে ফেললে। কাল থেকে প্রাকটিসে আসছ না। বিকেলে এসো। নইলে এ নিয়ে কথা উঠবে।'

মাঠ থেকে সোজা ডাক্তারের চেম্বারে। বেলা একটায় তিনি ভেতরে ডাকলেন। দেখা হওয়া মাত্র বললেন, 'তেমন কোনও ভয় নেই। আমি সমস্ত রিপোর্ট পেয়ে গেছি। কতদিন বিয়ে হয়েছে?'

'চারমাস।'

'মাইগড! শোন, আহিরের ইউটেরাসে দুটো বড় টিউমার রয়েছে। পিরিয়ডের সময় বেশি ব্লিডিং এবং যন্ত্রণা ওর আগেও হত, হয়তো এবারের মতো মারাত্মক হয়নি। মোটের ওপর, ও ব্যাপারটাকে এতদিন আমল দেয়নি। এই টিউমার রিমুভ করা দরকার, এখনই।'

'তাতে কোনও ভয় নেই।'

'না। জলের মতো সহজ ব্যাপার। অপারেশনের পর সপ্তাহ তিনেক বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর জীবন বাঁচবে।' ডাক্তার দত্ত হঠাৎ গলা নামালেন।

'কিরকম খরচ হবে?'

'খরচ? তুমি এখন খরচের কথা চিন্তা করছ? খরচ যাই হোক, ধার করেও ওকে তুমি বাঁচাতে চেষ্টা করবে না? কি? জবাব দাও?' খেপে গেলেন ডাক্তার দত্ত।

'নিশ্চয়ই।'

'গুড। সমস্যা হল, তোমাদের কোনও সন্তান হয়নি। ইউটোরাস বাঁচিয়ে ওই টিউমার দুটো রিমুভ করা যায়। কিন্তু বায়োপসি রিপোর্টে

খারাপ কিছু পেলে দ্বিতীয়বার অপারেশন করতে হবে। সেই ধকল মেয়েটা সামলাতে পারবে কিনা জানি না, খরচও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।' ডাক্তার দত্তকে আবার চিন্তিত দেখাল।'

'বায়োপসি রিপোর্টে খারাপ মানে কী ?'

ডাক্তার দত্ত বললেন, 'আমাদের শরীরে ক্যানসারের আশ্রয়স্থল হল টিউমার। সব টিউমারই যে ক্যানসারের বাসা তা নয়। নিরীহ টিউমারের সংখ্যাই বেশি। মেয়েদের ইউটেরাস এবং কিছুটা ব্রেস্টে টিউমার হলে এবং তাতে যদি ক্যানসারের বাসা থাকেও, বাদ দিলে বাকি শরীরটা বেঁচে যায় কারণ ওগুলোকে সহজেই আলাদা করা সম্ভব। গলা বুক পেটের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। ইউটেরাসে ক্যানসার হলেও প্রাথমিক অবস্থায় অপারেশন করায় অনেকেই দীর্ঘজীবী সুস্থ থাকেন। কিন্তু এর ফলে মেয়েদের বাচ্চাধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। যদি দেখি ওকে বাঁচাতে এ ছাড়া উপায় নেই তা হলে সেজন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে হবে।'

'আমার বাচ্চার কোনও দরকার নেই। ওকে বাঁচিয়ে দিন।'

'শাবাশ।'

৮

বিকেলে নার্সিং হোমে ঢুকতেই মাসির সঙ্গে দেখা। তিনি স্বপ্নাশিষের বাড়িতে গিয়েছিলেন অনেকদিন কোনও খবর না পেয়ে। সেখানে হরিমাধবদার দিদির কাছে জেনে ছুটে এসেছেন নার্সিং হোমে। স্বপ্নাশিষ কেন তাঁকে কিছু জানায়নি এই প্রশ্ন করে রাগারাগি করলেন। স্বপ্নাশিষ বলল, 'আমার মাথার ঠিক নেই মাসি।'

'কেন ? ডাক্তার কী বলেছে ?'

স্বপ্নাশিষ জানাল। মাসি ওর হাত ধরলেন, 'কেন লোকে ভগবানকে দয়ালু বলে জানি না, আমি তো সারাজীবন ধরে তাঁকে নির্মম হয়ে থাকতে দেখলাম। আহির জানে ?'

'না।'

'ওর বাবা মা ?'

'আহির খবর দিতে নিষেধ করেছে।'

'ঠিক আছে, সেটা আমি বুঝব। দ্যাখ স্বপ্ন, আমার তো বাচ্চা নেই, তাই না ?'

'মাসি, আমি বলেছি শুধু আহিরকে সুস্থ করে দিতে, আর কিছু চাই

না।'

ওরা দুজনে আহিরের কাছে গেল। আহির বিছানায় বসেছিল। এখন ওকে অনেক তাজা দেখাচ্ছে। মাসিকে দেখে বলল, 'ওমা, আপনাকেও টেনে এনেছে। দেখুন না, সামান্য ব্যাপার নিয়ে কিরকম ঝামেলা পাকাল। আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি।'

ডাক্তারবাবু এলেন সন্ধে নাগাদ। বললেন, 'মা, একটা ছোট্ট অপারেশন করতে কবে। একটুও কষ্ট পাবে না। তবে তার আগে আরও কয়েকটা টেস্ট করতে চাই।'

'অপারেশন ?' মুখ গম্ভীর হয়ে গেল আহিরের।

'হ্যাঁ। টিউমার তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। ওটা বাদ দিতে হবে।'

'না বাদ দিলে হয় না ?'

'না। তুমি আজ বাড়ি চলে যাও। কি কি টেস্ট করাতে হবে লিখে দিচ্ছি। দিন দশেক বাদে আবার এখানে আসবে।'

'একটু পরে করলে হয় না ? ও দিল্লিতে যাবে রঞ্জি ট্রফি খেলতে ?'

'তাই নাকি ?' ডাক্তার দত্ত স্বপ্নাশিষের দিকে তাকালেন, 'তুমি ক্রিকেট খেলো বলেছিলে কিন্তু ওই লেভেলে খেলো তা তো বলোনি। ঠিক আছে, তুমি ফিরে এলেই হবে তবে এর মধ্যে টেস্টগুলো করাতে হবে। ইনি ?'

স্বপ্নাশিষ বলল, 'আমার মাসি।'

'নমস্কার। আমি ভেবেছিলাম দুকুল বিসর্জন দিয়ে তোমরা স্বয়ম্ভু হয়ে আছ। আপনি যখন আছেন তখন চিন্তা নেই।'

'আপনি লিখে দিন কী করতে হবে। তবে আমি সাউথে থাকি, ওখানেই করাব। তাতে আমার সুবিধে। ওকে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না-না।' আহির আপত্তি জানালো।'

'চুপ কর। আর পাকামো করতে হবে না। এতদিন ধরে রোগটা পুষে রেখেছিস কেন ? তখন মনে ছিল না।' মাসি ধমকে উঠলেন।

স্বপ্নাশিষ স্বস্তি পেল। মাসি জোর করেই আহিরকে নিয়ে গেলেন। নার্সিং হোম থেকে ছাড়ার আগে ডাক্তার দত্ত ওকে পরীক্ষা করলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'আর দেরি করা উচিত হবে না। ভেবেছিলাম ইউটেরাস বাঁচাতে পারব, কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া—।' মাসির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও তো থাকছে না। আপনি একবার সরোজ গুপ্তর সঙ্গে দেখা করবেন। ডক্তর গুপ্ত খুব ভাল মানুষ। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওঁকে একবার দেখিয়ে নিন।' তারপর

স্বপ্নাশিষের কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'যাও হে, খবরের কাগজে তোমার খবর পড়তে চাই। সেটাই হবে আমাদের ইন্সপিরেশন।'

যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু আহিরের চাপে রাজি হতে হল। মাসির বাড়িতে যাওয়ার আগের রাত্রে আহির বলল, 'এই তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে দেবে ?'

বুক কেমন টাটিয়ে উঠল স্বপ্নাশিষের। এ ভাবে কখনও বলে না আহির।

চার দেওয়ালের মধ্যে আলো তেমন নেই। বিছানায় ওরা পাশাপাশি শুয়ে। স্বপ্নাশিষ হাত বাড়াল। আহির মাথা রাখল তার বুকে, 'তুমি আমাকে খুব ভালবাস, না ?'

স্বপ্নাশিষ জবাব দিল না। আহির বলল, 'উত্তর দিচ্ছ না যে !'

'তুমি তো জানো।'

'তোমাকে তা হলে দিল্লিতে গিয়ে সেঞ্চুরি করতে হবে। করবে তো ?'

'কেউ ইচ্ছে করলেই করতে পারে ?'

'তুমি পারো। আমার কথা ভাবলেই পারবে।'

স্বপ্নাশিষ দুহাতে মুখটা আঁকড়ে ধরতেই ভেতরটা কেঁপে উঠল।

আহির বলল,'আমার কিছু হবে না। দেখো। কত মানুষের তো সন্তান হয় না, আমার না হলে তুমি কি খুব কষ্ট পাবে ?'

'মোটেই না। আমার কিছুই চাই না, শুধু তুমি ভাল থাকো।'

'আমি ভাল থাকবই।'

সেই রাত্রে দুটো শরীর একত্রিত অথচ শরীর উত্তাপহীন। শরীর থেকে উঠে আসা অনুভূতি একাকার হয়ে আনন্দ, শঙ্কায় মিলেমিশে এক অন্য জগৎ তৈরি করে দিয়েছিল। স্বপ্নাশিষের মনে হচ্ছিল যে যদি কোনও জাদুতে আহিরের রক্তে মিশে গিয়ে ওর শরীরটাকে সমস্ত রোগমুক্ত করতে পারত। আর আহির চোখ বন্ধ করে দেখছিল হাজার হাজার মানুষের হাততালির জবাবে স্বপ্নাশিষ ব্যাট তুলে মাথা নোয়াচ্ছে।

৯

খবরের কাগজে বেরিয়েছিল স্ত্রীর কঠিন অসুখের জন্যে প্র্যাকটিসে না আসতে পারা সত্ত্বেও স্বপ্নাশিষকে দিল্লিতে যেতে দেওয়া হল। সন্তোষ বাজপেয়ি যে এ ব্যাপারে প্রভাব খাটিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম হলে দল থেকে বাতিল করে দেওয়া হবে বলে সতর্ক

করা হল।

খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে পিতৃদেব দেবাশিষকে ডাকলেন, 'তোমার ভাই-এর স্ত্রীর নাকি কঠিন অসুখ হয়েছে। তুমি জানো ?'

'না। আপনি নিষেধ করেছেন যোগাযোগ রাখতে।'

'হুম্। বিয়ে করতে না করতে ঠেলা টের পাচ্ছে। বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছে, কত ধানে কত চাল নিশ্চয়ই বুঝে গেছে এতদিনে। আমার কী ?'

'মাসি হয়তো খবর জানেন।'

'আমার জানার দরকার নেই।'

কিন্তু সেই সকালেই একটা ট্যাক্সি এসে থামল বাড়ির সামনে। একজন প্রৌঢ়া মহিলা ঘোমটা মাথায় নামলেন ট্যাক্সি থেকে। সঙ্গে একটি যুবক।

দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি স্বপ্নাশিষের বাবা ?'

'ছিলাম। আপনি ?'

'আমি আহিরের মা। ওর কী হয়েছে ?'

'উত্তরটা আপনি যেমন জানেন না আমারও জানা নেই।'

'ওরা কোথায় আছে ?'

'বসুন। হ্যাঁ, সেটাও আমি জানি না।'

'আপনার ছেলে— ?'

'মেয়ে তো আপনারও।'

'কাগজে দেখলাম আহির খুব অসুস্থ।'

'ওর বাবা খবরটা দেখেননি ?'

'তিনি এখন শয্যাশায়ী।'

'ও। দেখুন, আমার ছেলে আমাকে অস্বীকার করে আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমি তারপর থেকে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

'আপনারা, পুরুষরা, একই ধাতুতে গড়া। আপনার স্ত্রী বেঁচে থাকলে— ! ঠিক আছে, আপনি জানেন না, সে কোথায় আছে ?'

'না।'

'আপনার ছেলের এক মাসি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর ঠিকানাটা জানতে পারি কি ?' আহিরের মা উঠে দাঁড়াল।

'তিনি যখন গিয়েছিলেন তখন তার প্রস্তাব মেনে নেননি কেন ?'

'কারণ আমাদের বাড়িতে আপনার ডুপ্লিকেট আছে।'

'ইমপসিব্‌ল। আমার ডুপ্লিকেট ? ফাজলামি !'

'আপনি অনুগ্রহ করে একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন। ওঁর ঠিকানা পাওয়া যাবে ?'

এইসময় পাশে দাঁড়ানো যুবক বলল, 'ছেড়ে দিন কাকিমা। স্বপ্নাশিষের কোচ হরিমাধববাবুর কাছে চলুন। দেশপ্রিয় পার্কে গেলে ওঁর খবর পাব।'

মাথা নাড়লেন মহিলা, 'আমার মেয়ে অসুস্থ, সত্যি তো, আপনার কী !'

'এতদিন যেন মেয়ে সম্পর্কে আপনারা কত আগ্রহী ছিলেন। ঠিক আছে, ওর মাসির ঠিকানা দিচ্ছি কিন্তু তাই বলে তারা যেন মনে না করে আমি খুব পুলকিত হয়ে দিলাম।'

দিল্লির কেটলাতে টসে জিতে বাংলা ব্যাট নিল। প্রথম বলটার মুখোমুখি হয়েই স্বপ্নাশিষ বুঝতে পারল আজ তার দিন নয়। বল যেভাবে বাঁক নিল সে ধরতেই পারে না। মনের ওপর যে গভীর চাপ তা কিছুতেই সরাতে পারছিল না। দুটো বল সে কোনওমতে ঠেকাল। চতুর্থ বলটার গতি সে বুঝতেই পারেনি। কপালজোরে আধ ইঞ্চির জন্যে উইকেট ভাঙল না তার। পঞ্চম বলটা তার ব্যাটের কোণে লেগে থার্ড স্লিপে ক্যাচ উঠল কিন্তু তার আগেই আম্পায়ার নো ডেকেছিলেন বলে আর একটা ফাঁড়া গেল। নো ডাকটা তার কানে পৌঁছয়নি। শেষ বলের আগে সোজা হয়ে দাঁড়াল। না, এ ভাবে সে হারবে না। পাঁচবার তাকে যেমন ইচ্ছে নাচিয়েছে বোলার। দিল্লির খেলোয়াড়রা বুঝতে পেরে গেছে যে কোনও মুহূর্তে সে উইকেট ছুড়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু সে হার মানবে না। আহির তাকে বলেছে সেঞ্চুরি করতে। পারুক না পারুক চেষ্টা তো করা উচিত। অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে ওইটেই আহিরের একমাত্র ইচ্ছে। ষষ্ঠ বলটা প্রচণ্ড জোরে মারল সে। মিড অফ-এর ওপর দিয়ে সোজা চার। এরকম একটা মার আশা করেনি বোলার। কোমরে হাত রেখে স্বপ্নাশিষকে দেখে নিল।

একটা মারকুটে ইনিংস খেলল স্বপ্নাশিষ। চল্লিশ বলে ষাট রান। মোট ওভার তখন আট। ষাট রানের মাথায় তার মনে হল ডক্টর সরোজ গুপ্তের কাছে মাসির যাওয়ার কথা ছিল, তিনি কী বললেন না জানা পর্যন্ত স্বস্তি হবে না। এল বি ডব্লু হয়ে গেল স্বপ্নাশিষ। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল সে ক্রিজ থেকে। দিল্লির খেলোয়াড়রা হাততালি দিচ্ছে। ম্যানেজার বলল, 'ওয়েল ডান।' স্বপ্নাশিষ মনে মনে বলল, 'হেরে গেলাম আহির, তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।'

বাংলা অল আউট হল দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে দুশো সত্তর রানে। দিল্লির পক্ষে এ রান তোলা জলভাত। সেদিনের কাগজগুলো লিখেছেন, 'বাংলার নবীন ওপেনার স্বপ্নাশিষ নড়বড়ে শুরু করার পর রাজত্ব করেছেন। এটা যদি তাঁর ধরন হয় তা হলে প্রতিবার ভাগ্য তাকে দ্বিতীয় ওভার শুরু করতে সাহায্য করবে না।' দ্বিতীয় দিন শেষ হল দিল্লির চার উইকেটে একশো সত্তর রানে। সেই রাত্রে বৃষ্টি নামল। পরের দিনও তুমুল বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত কোশেন্টে বাংলা জিতে গেল। রাজধানী এক্সপ্রেসে ওরা হাওড়ায় পৌঁছাতেই প্রচুর অভিনন্দন, মালা। সন্তোষ বাজপেয়ি বললেন, 'শুনেছি তুমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে ব্যাট করেছে। তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'জানি না। আমি এখনই যেতে চাই ওর কাছে।'

'তোমার কি টাকাপয়সা লাগবে?'

'দেবেন আমাকে? ওর অপারেশন হবে। আপনার কাছে যেতাম আমি!'

'বিকেলে এসে হাজার দশেক নিয়ে যেয়ো।'

মাসির বাড়িতে পৌঁছে দরজা বন্ধ দেখে বুক ছ্যাঁত করে উঠল। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা বললেন, 'উনি নার্সিং হোমে গিয়েছেন। শ্যামবাজারে।'

জিনিসপত্র ভদ্রমহিলার কাছে রেখে সে ছুটল পাতাল রেল ধরতে। ডাক্তার দত্তের নার্সিং হোমে পৌঁছে স্বপ্নাশিষ দেখল মাসি আর একজন প্রবীণার সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি, 'কখন এলে?'

'এইমাত্র। আহির কেমন আছে?'

'ভালই। এঁকে প্রণাম করো, আহিরের মা।'

স্বপ্নাশিষ স্থির হল। আহির জানে? শেষপর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে প্রণাম করল। ভদ্রমহিলা ঠোঁট কামড়ালেন, 'কী বলব! এ ভাবে কেউ যেন তার জামাইয়ের দেখা না পায়!'

স্বপ্নাশিষ বুঝল ভদ্রমহিলা একাই এসেছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আহির কী করছে?'

'শুয়ে আছে। তোমার সঙ্গে কথা আছে বাবা।' ভদ্রমহিলা বললেন।

স্বপ্নাশিষ তাকাল।

'আমার মেয়েকে তুমি খুব ভালবাস, না? যে কদিন ও আছে, সেই কদিন ওর মন আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারবে?' ভদ্রমহিলা কেঁদে

ফেললেন।

মাসি বললেন, 'ছিঃ। একী বলছেন?'

স্বপ্নাশিষ বিড়বিড় করল, 'যে ক'দিন আছে মানে?'

মাসি বলল, 'কিছু না রে! উনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। আহিরের ইউটেরাসে টিউমার হয়েছিল। সেটা তুই জানিস। কিন্তু ডক্টর গুপ্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন ওর ব্রেস্টেও টিউমার আছে। এক্সরেতে ধরা পড়েছে।'

'সেকী!' নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যেন। স্বপ্নাশিষ টলছিল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ক্যানসার একবার হলে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। উঃ।'

'আপনি আবার ভুল করছেন। আহিরের ইউটেরাসের টিউমারের সঙ্গে ব্রেস্টের টিউমারের কোনও সম্পর্ক নেই। দুটো আলাদা আর জায়গার বাইরে স্প্রেড করেনি। অপারেশন করলেই বিপদ চলে যাবে।'

'অপারেশন কবে হবে?'

'আজ বিকেল তিনটেয়। ডাক্তার দত্ত আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। আমি তোর কথা বলেছিলাম। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন আজই তোর ফেরার কথা। বললেন তুই যদি আহিরের ভাল চাস তা হলে আপত্তি করবি না।' মাসি বললেন।

'সবাই খবর পেয়েছে?' ঘসঘসে গলায় জিজ্ঞাসা করল স্বপ্নাশিষ।

মাসি বললেন, 'হ্যাঁ। ইচ্ছে হয় আসবে, আমাদের বলা উচিত, বলেছি।'

স্বপ্নাশিষ বলল, 'মাসি দশ হাজার টাকার ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কী করে পেলি?'

'যে ক্লাবে সামনের বছর খেলব তারাই দিচ্ছে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না বাবা। এটা আমাকে করতে দাও। আহিরের বিয়ের জন্যে যত গহনা আমি গড়িয়েছিলাম সেগুলো এনেছি।'

স্বপ্নাশিষ কোনও কথা না বলে ভেতরে চলে এল। এখন যাওয়ার সময়। কিন্তু আজ আহিরের অপারেশন হবে বলে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। আহির শুয়ে বই পড়ছিল। পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফেরাল, 'তুমি।'

একশো পদ্মের বিভা ফুটে উঠল সেই মুখে, স্বপ্নাশিষের মনে হল বোধনের দুর্গাঠাকুর দেখছে। এত সুখ পৃথিবীর কোনও মানুষের মুখে দিতে পারেননি ঈশ্বর।

স্বপ্নাশিষ শব্দ খুঁজে পেল না। পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আহির ওর হাত

www.MurchOna.com

ধরল, 'স্টেশন থেকে ?'

'হ্যাঁ। আমি সেঞ্চুরি করতে পারিনি।'

'কিন্তু তোমার জন্যে টিম জিতেছে।'

'এত খবর রাখো ?'

'হুঁ। তোমার জন্যে।'

'কী বই ওটা ?'

'জীবনানন্দ দাশ।'

কোন কবিতা ?'

'আমার মনে অনেক জন্ম ধরে ছিল ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছ পদ্মপাতা ;
হয়েছ তুমি রাতের শিশির—
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার পর ;

তবুও পদ্মপত্রে এ জল আটকে রাখা দায়। কোন কবিতা বলতে পারো ?'

'তোমাকে ভালবেসে ?'

'উঃ। দারুণ। কী আনন্দ ! আমাকে একটা চুমু দিতে দেবে ?'

স্বপ্নাশিষ মুখ নামাল। আহির তার গালে ঠোঁট রেখে বলল, 'ভাল কী ভাল। একদিন খুব খারাপ কথা বলেছিলাম। তোমার প্রিয় কয়েকটা লাইন বলবে ?'

স্বপ্নাশিষ মনে করে বলল, 'একদিন মনে হত জলের মত তুমি।
সকালে রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—'

বাধা দিল আহির, 'তোমাকে।'

স্বপ্নশিষের মনে হল আহির একটা খেলায় মেতেছে। যে খেলায় মাতলে কিছুক্ষণ সময় ভুলে থাকা যায়। সে গম্ভীর হল, 'আহির তোমার আজ অপারেশন !'

'শুনেছ ? আমার সব বাদ দেবেন ডাক্তার।'

'সব। সব কি বাদ দেওয়া যায় ?'

'পুরুষরা তো মেয়েদের সর্বস্ব বলতে এই বোঝো ?'

'সেসব পুরুষের ছায়া খুব কালো।'

'কী দারুণ বললে। তুমি ক্রিকেট ছেড়ে কবিতা লেখো।'

'ক্রিকেটের বর্ণনায় অনেকে কবিতা লেখে।'

'যাকগে। আমি যদি মরে যাই ?'

'সূর্য যদি পশ্চিমে ওঠে !' হাসল স্বপ্নাশিষ।

'এত জোর কী করে পাও ?' আহির বলল, 'আমি ডাক্তার দত্তকে জিজ্ঞাসা করেছি। উনি বলেছেন অপারেশন ঠিক হলে অন্তত পাঁচ সাত বছরের জন্যে নিশ্চিত। স্বপ্ন, আমি আরও পাঁচ বছর তোমাকে পেতে চাই। পাঁচ বছর আমার পাঁচজন্মের আনন্দ। তুমি আমাকে ভালবাসবে ?'

'হঠাৎ এই প্রশ্ন ?'

'আমি তো আর নারী থাকব না !' চোখ উপচে জল গড়িয়ে এল। স্বপ্নাশিষের মনে হল অনেক রক্ত জলের ফোঁটা হয়ে যাচ্ছে।

'অঙ্গ যেখানে থাকবে সেখানে প্রত্যন্ত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? আমি তোমাকে চাই। এই মুখ, এই হাসি, এই কথা, ব্যস এইটুকু। পৃথিবীর কোটি কোটি নারীর ইউটেরাস অথবা বুকের সঙ্গে তোমার পার্থক্য আমি করতে পারব না কিন্তু পৃথিবীর কোনও মানুষীর মুখ তোমার মুখকে আড়াল করতে পারবে না।'

'তুমি ঠিক বলছ।'

'ঠিক।'

'তিনবার বল।'

'ঠিক ঠিক ঠিক।'

অপারেশন থিয়েটারের দরজায় লাল বাতি জ্বলছে।

সময় দীর্ঘতর হচ্ছে। মাসি এবং আহিরের মা পাশাপাশি বসে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে। নার্সিং হোমের এই ঘরে এখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কিছু মানুষ। এঁদের কেউ হয়তো আহিরের বাবা কিংবা তার পিতৃদেব অথবা দাদা। কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু সময় চলে যাচ্ছে। নিঃশব্দে। যেভাবে আজ আগামীকাল হয়, কাল মহাকালে পৌঁছে যায়।

স্বপ্নাশিষ মনে মনে দৌড়ে যাচ্ছিল। এই উইকেট থেকে ওই উইকেট। তার সঙ্গী আহির। ক্রিকেটে যেটা নির্দিষ্ট মাপের দূরত্ব, জীবনে তা নয়। তবু দৌড়ে যেতে হয়। দুই ক্রিকেটার পরস্পরকে অতিক্রম করার সময় কথা বলে না কিন্তু আহির তাকে প্রতিবার বলে যাচ্ছে, বলে যাবে যে শব্দটা তাই তার গায়ত্রীমন্ত্র, পাঁচ কিংবা সাত বছরের স্বপ্ন নিয়ে যে মেয়ে বেরিয়ে আসবে অপারেশন থিয়েটার থেকে তাকে দুহাতে আগলে রাখার শপথ নিচ্ছিল স্বপ্নাশিষ, সমস্ত বেদনা একত্রিত করে।

www.MurchOna.com

Moner Moto Mon by Somoresh Majumdar

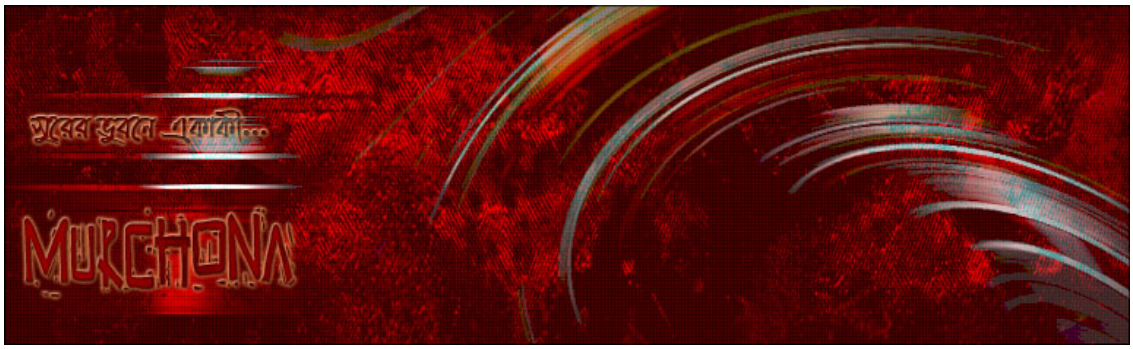

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com